# বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

শ্রীসুকুমার সেন

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা
১৩৪১

প্রকাশক
শ্রীসজনীকান্ত দাস
২৫।২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস, লিঃ
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

"প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েষু

# ভূমিকা

বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লেখকদিগের হস্তে আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-ভঙ্গি অভূতপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের অপরাপর ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির কথা দূরে থাকুক, অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন বিদেশী ভাষাতেও এইরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও ঐশ্বর্য্যশালী গদ্য-ভঙ্গি ও সাহিত্য নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার ন্যায্য অধিকার আছে।

বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গি সম্বন্ধে দুই একটি বই থাকিলেও, এই বিষয়ে যথার্থ গবেষণা কিছুই হয় নাই। ১৩৪০ সালের ব ঙ্গ শ্রী পত্রিকার জন্য আমি বিভিন্ন লেখকদিগের গদ্য-ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সেই প্রবন্ধগুলি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকটি রচিত হইল।

যে সকল বন্ধুদিগের প্ররোচনা এবং উৎসাহ বাঙ্গালা গদ্যের এই আলোচনায় আমাকে সানন্দে প্রবৃত্ত করাইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি আমি এইখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বৈশাখ ১৩৪১

শ্রীসুকুমার সেন
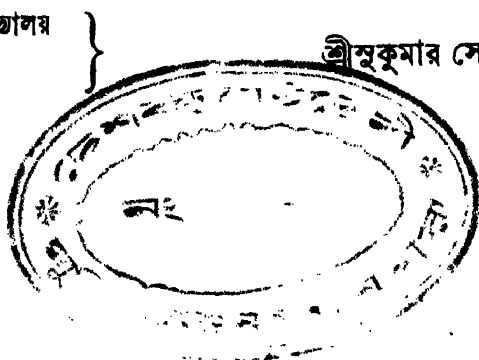
# বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের কোন স্থান ছিল না। তাহা থাকিবারও কথা নয়, কেন না তখনকার দিনে সাহিত্যিক রস-বোধের প্রেরণা ছিল মুখ্যতঃ আবেগ ও গৌণতঃ অনুভূতির মধ্যে। আর গদ্য সাহিত্যে রস-বোধের প্রেরণা আসে প্রধানতঃ বোধ ও যুক্তিজ্ঞান হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান সকল আর সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ লোককে খুসী করা, যে সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ, সুবিধা বা যোগ্যতা লাভ করে নাই। আরও একটা কথা আছে, তখনকার সাহিত্য ছিল কাব্যমূলক এবং সেই কাব্য ছিল সঙ্গীতমূলক। অর্থাৎ এখনকার মত সেকালে কাব্য পড়া হইত না, গাওয়া হইত। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, এই কারণে সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত লোকও এই 'পাঁচালী'[১] সাহিত্যে আনন্দ লাভ করিত।

গীতিমূলক হওয়াতে সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন কথা-বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর না থাকায় কেবলই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ চলিতেছিল

১। পুরাতন বাঙ্গালার এই ছন্দঃ-গীতিমূলক সাহিত্যকে 'পাঁচালী' বলা হইত। মালাধর বসু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে (১৪৭৩—১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) রচনার কৈফিয়তে বলিয়াছেন—

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥

এইরূপ বোধ হয়। আর কথা-বস্তুর মধ্যেও পৌরাণিক অপেক্ষা লৌকিক বা ছদ্ম-পৌরাণিক কাহিনীর আদর অত্যধিক ছিল। সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতার অভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে সেকালের লোকের সাহিত্যিক রুচির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই মুখ্যতঃ হীন-কথামূলক সাহিত্য যে লোকের রুচি বিগড়াইয়া দিয়াছিল আর ইহা যে দেশের নৈতিক অবনতির বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের এক সুসভ্য অঞ্চলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক রুচি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়া বৃন্দাবন দাস শ্রী চৈ ত ন্য-ভা গ ব তে বলিয়াছেন—

ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।<br>
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥<br>
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।<br>
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥<br>
ধনবংশ বাড়ুক বলিয়া কাম্য মনে।<br>
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥<br>
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।<br>
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥<br>
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।<br>
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

[ অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় ]॥

এই সাহিত্যে বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ও করুণ রসের একটা দিক ছিল। তাহা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্য-গীতি। সীতারাম-গীতির মধ্যেই তখন সাহিত্যে বিশুদ্ধ রস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে রামায়ণ কাহিনী শুনিয়া যবনেরও মন করুণ রসে আর্দ্র হইয়া যাইত।

মালাধর বসু শ্রী কৃ ষ্ণ-বি জ য়ে বলিয়াছেন—

কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥

যাহা হউক পঞ্চদশ শতকের শেষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে। গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বসু খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩—১৪৮০ সালে শ্রী কৃ ষ্ণ-বি জ য় কাব্য রচনা করেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমনে ও প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর হইয়া গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালায় যে সুর আনিয়া দিল তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও, এখনো পর্য্যন্ত বাজিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানতঃ আবেগমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটি শাখা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সাহিত্য। বোধ ও যুক্তিমূলক সাহিত্যের সূত্রপাত ইহারই মধ্যে। এই সাহিত্যও ছন্দে রচিত। তাহার কারণ, সাধারণ লোক ছন্দঃ বা গীতি না হইলে গ্রাহ্য করিবে না। দ্বিতীয়তঃ অনতিস্বল্প-পরিসর পয়ার[১] ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার সরলবাক্যমূলক রীতি সুন্দর অবকাশ পায়। বাঙ্গালা গদ্যের তালের সহিত পয়ারের আট ও ছয় মাত্রার যতির বেশ সুসঙ্গতি ও ঐক্য আছে। সুতরাং পয়ারের মধ্যে দিয়া ভাবপ্রকাশের বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। বরঞ্চ সুবিধাই হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের জড়তামুক্তি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্য-

১। পয়ারই বাঙ্গালার মূল এবং বিশিষ্ট ছন্দঃ, আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারেরই সবিশেষ প্রধান্য। ত্রিপদীর প্রয়োগ খুবই অল্প ছিল, ইহার প্রয়োগ হইত প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের জন্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারের প্রাধান্যের দরুন ছন্দের আর এক নাম দাঁড়াইয়া যায়, ‘পয়ার’। মালাধর বসুর উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। ষোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা অনুমান করিতেও ভয় হয়। পয়ারের মধ্যে সংস্কৃতমূলক অব্যয়, অথবা অসমাপিকার প্রাচুর্য্য অথবা তালবিহীন বাক্যজাল প্রয়োগের সুযোগ একেবারেই নাই, এজন্য পয়ারের ছাঁদে পর পর সরল বাক্যের মধ্য দিয়া স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। সকল রকম ভাবপ্রকাশে পয়ার ছন্দের কতদূর ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহার প্রমাণ মিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত গ্রন্থে।

তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠি-পত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে। ষোড়শ শতকে লেখা চিঠি শুধু একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে।[১] পত্রটি ১৪৭৭ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৫৫৫ সালে) লিখিত হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটি আহোমরাজ চুকামফা স্বর্গদেবকে লেখেন। এই পত্রটির মধ্যে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব প্রত্যন্তের উপভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সাধুভাষার রূপ বাঙ্গালা গদ্যে একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। সপ্তদশ শতক হইতে চিঠিপত্রাদিতে কিছু কিছু আরবী ফারসী কথা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই পত্রটিতে কিন্তু সে সব কিছুই নাই। পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

……লিখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব ঙ্গ-সা হি ত্য-প রি চ য় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭২ দ্রষ্টব্য।

চাউলিয়া আমরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তাময়ার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।......

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে রচিত নিজেদের সাধনা বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে এইরূপ পুস্তক কেবল পদ্যেই রচিত হইত। গদ্যে রচিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ গুরু শিষ্যের মধ্যে কথোপকথনমূলক হইত। সপ্তদশ শতকের কোন হস্তলিপি না পাওয়ায় এই গদ্যের ভাষাকে ঠিক সপ্তদশ শতকের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এইরূপ বৈষ্ণব সাধন-গ্রন্থের প্রাচীনতম পুঁথির তারিখ অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বে নহে। সুতরাং এই গদ্যের ভাষা পরে আলোচনা করা যাইবে।

শূন্যপুরাণে অল্প কিছু গদ্যাংশ আছে। শূন্যপুরাণ সপ্তদশ শতকে লেখা, কিংবা তাহারও পরে। অনেকে ইহাকে সুপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শূন্যপুরাণের গদ্যাংশ ছড়া মাত্র, ইহাকে গদ্য বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। এই ছড়া বা মন্ত্রগুলি ভাঙ্গা পয়ারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কিছু তুলিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে পয়ারের রেশ বিলক্ষণ অনুভূত হইবে।

পচ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত ঘাটে নির্ম্মান করি দিব।[১]

ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে পোর্ত্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা দেশে আগমন ঘটে। ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ দুইখানি পুস্তক যে খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল,

১। শূন্য পুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ৮১।

তাহার প্রমাণ আছে।[১] পোর্ত্তুগীসদের রচিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ষোড়শ শতকের শেষপাদে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অবধি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। এই খ্রীষ্টানি সাহিত্যের উদ্ভব ঢাকা অঞ্চলে হইয়াছিল, সুতরাং ইহার মধ্যে যে উক্ত অঞ্চলের উপভাষার রূপ ও বাক্যরীতি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অধিকন্তু এই সাহিত্যের উদ্ভব পোর্ত্তুগীস পাদ্রির হাতে এবং ইহার মূল পোর্ত্তুগীস ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে, সেই জন্য ইহার বাক্য-রীতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ঢং জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও দেখা যায় যে তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছে। এই গদ্যের ভঙ্গি ও বাক্যরীতি পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তনিও প্রণীত প্রশ্নোত্তরমালা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ভূষণার এই রাজকুমারকে খ্রীষ্টীয় ১৬৬৩ সালে মগেরা বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। এক পোর্ত্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে মগেদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লয়েন ও তাঁহাকে রোমান কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন [ পা দ্রি মা নো এল্-দা-আস্ সু ম্প্ সাম্-র চি ত বা ঙ্গা লা ব্যা ক র ণ, প্রবেশক, পৃষ্ঠা ৮/০ ]। দোম্ আন্তনিও রচিত এই বইখানি একটি খ্রীষ্টান পাদ্রি ও ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিচার লইয়া রচিত।

১। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *Bengali Literature in the 19th Century*. পৃঃ ৬৭-৬৮ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language*, পৃঃ ২৩৩ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত পা দ্রি মা নো এ ল্ দা-আ স্ সু ম্প্ সা ম্ র চি ত বা ঙ্গা লা-ব্যা ক র ণ প্রবেশক, পৃঃ ॥/০ দ্রষ্টব্য। ( এই তিনখানি পুস্তকই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। )

বইখানি ছাপা হয় নাই। ইহার মূল পাণ্ডুলিপি পোর্ত্তুগালের এভোরা নগরে আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এভোরা নগরে গিয়া এই বইটির অধিকাংশ নকল করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং তাহার কিয়দংশ ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার "উপাসনা" পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা গদ্যের আদ্য ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই বইটির সাহায্য অপরিহার্য্য। বইটির সম্পূর্ণ মুদ্রণ অত্যাবশ্যক। বইটি রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ। পোর্ত্তুগীস পাদ্রিরা এই রকমই করিতেন।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তকটির নাম অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—"জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান কাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা জেণ্টুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার; ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় জেণ্টুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র কাথালিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সম্বন্ধ আছে।" [১]

পাদ্রি মানোএল্-দা-আসসুম্প্সাম্ এই পুস্তকটি পোর্ত্তুগীস ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই বইটির যতটুকু অংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের গদ্য-রীতির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ দিয়াই বাক্যের সমাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুস্তকের ভাষায় ল্যবর্থ (gerund), তুমর্থ (infinitive) বা শত্রর্থ (participle) অসমাপিকাযুক্ত বাক্যাংশ অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদের ব্যত্যাস (inversion of the normal word order)-ও যথেষ্ট রহিয়াছে। নঞ্ শব্দ (negative) ক্রিয়ার পূর্ব্বেই বেশীভাগ ব্যবহৃত হইয়াছে, কচিৎ ক্রিয়াপদের

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ", উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯ সাল পৃঃ ৬৪৬ দ্রষ্টব্য।

পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তো' 'সে' ও 'যে' শব্দের বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ সুপ্রচুর। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট, 'বল্' বা 'বোল্' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম, এবং 'বল্' বা 'বোল্' ধাতুটি ইংরেজী tell বা command এইরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'করিলা', 'পাইবা' ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ সম্মানসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে। সম্মানসূচক 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এখনো প্রচলিত হয় নাই। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি '-রে', '-কে' নহে। পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী প্রশ্নার্থক 'নি' এবং নিশ্চয়ার্থক ও সমর্থনসূচক 'হয়' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রকাশিত অংশটুকুর মধ্যে কোন আরবী-ফারসী শব্দ নাই। প্রকাশিত অংশ হইতে কিছু এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। [১]

[ ব্রাহ্মণ : ] হয় ; বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারো কপালে শুদা ( , ) ২ লিখন দেখি নাহি ( ; ) আমিও এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারণ কি ? তুমি কহ কি কারণ কারো এমত থাকে, কারো এমত না থাকে ?

[ রোমান কাথলিক : ] কারণ এই ( , ) কারো কপালের হাড় ৩ জোড়া ৪ থাকে তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা কপালের হাড়ের ৫ জোড়া ৪ কসাইয়া ৬ চাও এইখনে খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে ; তিনি এমত গড়িয়াছেন ৭, যাহার হাড় ৩ জোড়া ৪ না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখ তাহার শিরপীড়া ৮ অধিক না জন্মে, যাহার কপালে জোড়া৪ হাড় ৩ তাহার জোড়াতে ৪ জল ভর করিয়া মুণ্ডে বেদনা ৯ করে ; এহার অর্থ এই ; লিখন যে কহে এ মিথ্যা ১০ দেখ ; সেই মস্তকের চৌসুরা জোড়া৪, সেও সেইরূপ জোড়াগঠন ১১ ( , ) এহাতে বুঝিবে লিখন হয় কি নহে ; এ কথা অতি মূঢ়ের ১২, যে কহে কপালের লিখন।

---

১। উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯ পৃঃ ৬৪৯।

২। বন্ধনীস্থিত বিরাম-চিহ্ন মূলে নাই।

৩। har হার। ৪। zora জোড়া। ৫। harer হারের। ৬। খসাইয়া। ৭। gariassen গরিয়াছেন। ৮। xirpira শিরপীরা। ৯। bedena বেদেনা। ১০। mitha মিথ্যা। ১১। zoragothon জোরাগঠন। ১২। murer মুরের।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তকে রোমান লিপ্যন্তরীকরণ হইতে ঢাকা-অঞ্চলের তৎকালীন কথ্যভাষার উচ্চারণতত্ত্বের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার কিছু কিছু বিশিষ্ট পদ বা বাক্যরীতির পরিচয় থাকিলেও ইহা স্থূলতঃ সর্ব্ববঙ্গীয় সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহাও অবশ্য সত্য যে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে উচ্চারণভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিত পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার বর্ত্তমান সময়ের মত এত তফাৎ ছিল না।

আর একটি পুস্তকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া পোর্ত্তুগীস প্রভাবান্বিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালার প্রস্তাব শেষ করিব। যে পুস্তকটির কথা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। বইটির নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং ইহার রচয়িতা (বা পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদকারী) পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্। বইটি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া লিসবন সহর হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানিতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আস্সুম্প্সাম্ ঢাকা অঞ্চলে থাকিতেন, সুতরাং ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপ ইহার মধ্যে যথেষ্টই আছে। আস্সুম্প্সামের রচনারীতির প্রধানতম দোষ হইতেছে পোর্ত্তুগীস রীতির অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ। তাহা অবশ্য সর্ব্বত্র নহে।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে নঞ্ (negative) শব্দের প্রয়োগ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে পরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ভাষার মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। আস্সুম্প্সামের ভাষা দোম্ আন্তনিওর ভাষা অপেক্ষা কথ্যভাষার অনেক বেশী কাছাকাছি। পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদ বলিয়া আর পোর্ত্তুগীসের রচনা বলিয়া বাক্যস্থিত পদসমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের ব্যত্যাস (inversion of the normal word order) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-কে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

'করুক', 'করিবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, দোম আন্তনিওর পুস্তকে এই প্রয়োগ দেখা যায় নাই। সুতরাং এই প্রয়োগ যে সাধুভাষাসম্মত নহে, পরন্তু প্রাদেশিক কথ্যভাষামূলক, ইহা নিঃসন্দেহ। 'আমার গো' ( =আমার ), 'জপন না যায়', 'পাইবার' ( =পাইতে ), 'আণ্ঠু করিয়া' ( =হাঁটু গাড়িয়া ) ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষা হইতে গৃহীত। 'আমারদিগের', 'তাহারদিগকে' ইত্যাদি প্রয়োগ দুই পুস্তকেই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত '-দিগ',-'দে' বিভক্তির প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকের পূর্ব্বে মিলে না। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার দান? কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর ভাষার আর একটি বড় গলদ -'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার মূলক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃপদের সহিত প্রয়োগ। আরও, আস্‌সুম্প্‌সাম্‌ অনেক ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান অনুজ্ঞার সহিত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্ত গলদ সত্ত্বেও আস্‌সুম্প্‌সামের ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ হইতে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আধুনিক বাঙ্গালার গল্প সাহিত্যের এক পূর্ব্বতম রূপ বলিয়া ইহাকে নেওয়া চলে।

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন[১] পুরুষ শক্রু[২] আছিল; বিস্তর দিন তাহারা এক জনে আর জনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি[৩] দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল: লাগাল পাইয়া দুই জনেও তরোয়াল খসিয়া[৪] মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজোবন্ত সে আরো এক চোট, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয়[৫] হইল। পরাজয় হইয়া শক্রুরে[৬] মাফ চাহিয়া কহিল: ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর; তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন। জিননিয়া[৭] কহিল; খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ

১। colim. ২। xotro. ৩। soe gori. ৪।=খসাইয়া। ৫। porazoe. ৬। xotrere. ৭। যে জিতিয়াছে; 'জিন্নুনে'।

করুক। পরে তাহারে উঠাইল রক্তও পৌছাইল[১] ঔষধও[২] দিল, পরে দুই জন মিলিয়া বড়[৩] দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঁঠু[৪] করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন আকৃতিএ আঠের[৫] খিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন। এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল, এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজা দিল; যত দিন বাঁচিল[৬] অনেক পুণ্য করিল। বৃদ্ধ[৭] কালে পুণ্যে পূর্ণিত মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে[৮]।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তক রচনাকাল হইতে আস্‌সুম্পসামের পুস্তক রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ বছরের অধিক নহে। ইহারই মধ্যে এত বিদেশী (আরবী-ফারসী) শব্দ ঢুকিয়া গেল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে। দোম্ আন্তনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক সাধুভাষার লেখকদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষায় বিদেশী শব্দের অপ্রাচুর্য্য বা অসদ্ভাব।[৯] আর আস্‌সুম্প্‌সাম্ কথ্যভাষার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত সুপরিচিত বিদেশী শব্দগুলিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দোম্ আন্তনিওর বিষয়বস্তুও বিদেশী শব্দপ্রয়োগের সুযোগ দেয় নাই, ইহাও স্বীকার্য্য।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত যে কয়েকখানি চিঠি বা দলিল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গদ্যের সরল রূপ একেবারেই নাই। প্রথমতঃ ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহার হইত না; তাহাতে বাক্যের আদি ও অন্ত বুঝা দায় হইয়া উঠে। একই বাক্যের মধ্যে বিবিধ কর্ত্তৃপদযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্যে ও সংযোজক অব্যয়ের প্রাচুর্য্যে পাঠককে

১। ponsfailo. ২। oxodio. ৩। boro. ৪। anthu. ৫। ather. আনুনাসিকের অভাব লক্ষণীয়। ৬। banxilo. ৭। birdho. ৮। আস্‌সুম্প্‌-সামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রবেশক, পৃঃ ৩/০।

৯। দোম্ আন্তনিওর গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হইলে এই সম্বন্ধে দৃঢ় করিয়া কিছু বলা যাতে পারে না।ই।

দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৭১৭ সালে লিখিত একটি দলিল হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

…আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন…

অষ্টাদশ শতকের গদ্যের ভাষা জটিলতাপূর্ণ হইলেও যখন কথ্যভাষাকে অনুসরণ করিয়া লিখিত হইত তখন ইহাতে জটিলতা থাকিত না। দুঃখের বিষয় এই রকম রচনা বেশি পাওয়া যায় নাই। একটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় বলিতেছি।

অষ্টাদশ শতকে লেখা একটি গল্প বা উপকথায় সেই সময়ের বাঙ্গালা কথ্যভাষামূলক গদ্যের একটি অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম-স্থিত বাঙ্গালা কাগজ-পত্র ঘাঁটিয়া এই গল্পটি এবং অন্যান্য কতিপয় পত্রাদি উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করেন [ ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজ-পত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ঊনবিংশ ভাগ, পৃঃ ১২১-১২৪ ]। চলিত তৎসম শব্দের বিকৃত রূপ শুদ্ধ করিয়া দিয়া এবং তদ্ভব ও দেশী শব্দের শুদ্ধরূপ পাদটীকায় প্রদর্শিত করিয়া গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কমা ও দাঁড়ি চিহ্ন মূলে নাই। মূলে স্থানে অস্থানে কিছু কিছু দাঁড়ি চিহ্ন আছে, তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল। সাক্ষাৎ উক্তির চিহ্ন ( “ ” ) ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন বসাইয়া দেওয়া গেল।

মোঃ ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা, তাহার কন্যা নাম শ্রীমতী মৌনাবতী১, ষোড়শ বরিস্যা২, বড় সুন্দরী, মুখ চন্দ্রতুল্য, কেশ মেঘের রঙ্গ, চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত, যুগ্ম ভ্রূ৩ ধনুকের ন্যায়৪

১। মূলে ‘মৌনাবতি।’ ২। =বর্ষীয়া। ৩। মূলে ‘যুঙ্গ্য ভ্রূর।’ ৪। মূলে ‘নেয়ায়।’

ওষ্ঠ রক্তিম১ বর্ণ, হস্ত পদ্মের মৃণাল, স্তন দাড়িম্ব ফল, রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা, তার তুলনা আর নাঞী২ এমন সুন্দরী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী।৩ কন্যা পণ করিয়াছে, রাত্রের মধ্যে জে৪ কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা৫ করিব।৩ একথা ভোজরাজা সুনে৬ বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেক, এক এক রাজার পুত্রকে এক এক দিন। রাত্রের মধ্যে এক এক জনকে শয়ন ঘরে লইয়া শয়ন করায়। সে ঘরে আর কেহো৭ থাকে না, কেবল কন্যা আর রাজপুত্র। এক খাটে কন্যা সোয়ে৮ এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে৮। জে৩ রাজপুত্র জেমন৯ জ্ঞানবান হয় (।) সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে।৩ কন্যাকে কথা কহাইতে পারিলেক না, কত্তমৎ১০ প্রকার করিলেক তবু কন্যাকে কথা কহাইতে পারিলেক না।৩ এইরূপে অনেক দিন গেল পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কন্যার রূপগুণ সুনে১১ বড়ই তুষ্ট হইলেন। কাহাকেও কহিলেন না, সঙ্গে একজন মনুষ্য১২ লইলেন না, কেবল আপুনি১৩ একা বড় ঘোড়ায় আরোহণ হইয়া সিকারের১৪ নাম করিয়া দুই চারি রোজের পরে মোকাম ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজার বাটীতে উপস্থিত১৫ হইলেন। রাজার লোক জিজ্ঞাসা করিলেক, "কে তুমি, কোথা হইলে আইলে?" রাজা বিক্রমাদিত্য আপনার পরিচয় দীলেন১৬ না। কহিলেন, "আমি আত্তিত১৭।" একথা সুনে১১ শ্রীযুত ভোজরাজার লোক অপুর্ব্ব আসন বশীত্তে১৮ দীলেন১৬। রাজা বসিলেন। খাওানের১৯ অপুর্ব্ব অপুর্ব্ব সামিগ্র২০ আনিয়া দীলেন১৬। রাজা বিক্রমাদিত্য খাইলেন, পরে শয়ন করিলেন। বৈকালে শ্রীযুত ভোজরাজা সুনিলেন২১ এক আত্তিত১৭ আসিয়াছে। লোক পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী২২ জন্ন২৩ আগমন হইয়াছে এখানে, কী২২ নাম তোমার, প্রকৃত কহিবে।" তাহাতে রাজা আপনার নাম ভাঁড়াইয়া আর এক নাম কহিলেন। শ্রীযুত ভোজরাজা পুনর্ব্বার২৪ জিজ্ঞাসা করিলেক, "তোমাকে এমন সুন্দর এমন গুণবান দেখিতেছী২৫, বুঝি তুমি কোন রাজা হইবেক।"৩ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "আমি জে৪ হই তোমার পরিচয়ে কার্য্য কী২২ আছে? তোমার কন্যার পণ সুনিঞা২৬ আসিয়াছী২৭, আমি তাঁহাকে কথা কহাইব।" রাজা কহিলেন, "ভালোই, থাকহ।" পরে রাত্রে এক

---

১। মূলে 'রক্তিমে।' ২। =নাই। ৩। মূলে এখানে দাঁড়ি আছে। ৪। =যে। ৫।=বিবাহ। ৬।=শুনে। ৭।=কেহ। ৮।=শোয়। ৯।=যেমন। ১০।=কত্তমত। ১১।=শুনে। ১২।=মূলে 'মনস্য।' ১৩।=আপনি। ১৪।=শিকারের। ১৫। মূলে 'উবিস্থীত।' ১৬। =দিলেন। ১৭। অতিথ, অতিথি। ১৮। =বসিতে। ১৯।=খাইবার। ২০।=সামগ্রা। ২১।=শুনিলেন। ২২।=কি। ২৩। মূলে 'জন্ম্য।' ২৪। মূলে 'পুনুর্ব্বার।' ২৫।=দেখিতেছি। ২৬।=শুনিয়া। ২৭।=আসিয়াছি।

ঘরে দুই খাট বিছাইলেক। দুই জনে দুই খাটে শয়ন করিলেন। ক্ষণেক১ কাল পরে রাজা কীং২ করিলেন? তাঁহার সঙ্গে পোসা৩ দুই ভূত ছীল৪, তাহার নাম তাল বিতাল৫, তাহাকে স্মরণ করিলেন। তখনি তাহারা দুই জনে আইলেন। "কীং২ আজ্ঞা মহারাজ, কীং২ করিব কহ।" রাজা কহিলেন, "তুমি কন্যার খাটে গিয়া বইসহ, আমি জিজ্ঞাসা করিলে কথা কহিও।" তাল বিতাল৫ গিয়া কন্যার খাটে বসিল। পরে রাজা ডাকীয়া৬ কহিলেন, "এ ঘরে কে জাগ্রত আছহ?" তাল বিতাল৫ উত্তর দীলেক৭, "কী জন্য৮ ডাক মহারাজ৯।" রাজা কহেন, "একী১০ আশ্চর্য্য। কন্যার কথা নাঞী১১, তুমি কে?" তাল বিতাল৫ কহিলেক, "মহারাজ৯ আমি কন্যার খাট।" রাজা কহিলেন, "তবে তুমি সুনহ১২। এক দেশে এক সওদাগর ছীল১৩। সে বাণিজ্যেতে গিয়াছীল১৪। পরে তাহার জাহাজ ও নৌকা সকল ডুবিয়া গেল। এক থান তক্তা ধরিয়া সওদাগর কীনারায়১৫ উঠিল। সেই দেশে এক মায়ে১৬ মানুষ জল আনিতে আসিয়াছীল১৭। সে সওদাগরকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল।১৮ বিস্তর সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক।১৮ কতক দিন তাকাদী১৯ সেই থানে থাকীল২০।১৮ পরে এক দিন এক মালির মায়ে১৬, স্রে২১ বড় জাদুগীর, তার সঙ্গে (।) আর সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ২২ হইল। সে মালিনী২৩ এক ঔষধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া২৪ মারিলেক।১৮ সে ঔষধ তার গায়ে লাগিতে ভেড়া হইল। সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া২৫ বাঁদীয়া২৬ আপনার ঘরে লইয়া গেল। রাত্রে এক ঔষধ গায়ে ছোঁয়াইয়া মানুষ করে, দিনে আরবার ভেড়া করে।১৮ এইমত করিয়া প্রত্যহ বিহার২৭ করে।১৮ এক দিন সে ভেড়া দড়ি ছীঁড়িয়া২৮ পালিয়া২৯ এক রাজার বাটীর ভিতর গেল। রাজার লোক সে ভেড়া ধরিয়া কাটীয়া৩০ (।) তাহার মাংস (।) খাইলেক।১৮ বল যুনি৩১ রাজকন্যার খাট, অপরাধ কার হইল।১৮" তাল বিতাল৫ কহিলেক, (।) "জে৩২ মায়ে১৬ জলের ঘাট হইতে (।) লইয়া গিয়া বাঁচাইয়াছিল সকল দোষ তাহার হইল।

---

১। মূলে 'ক্ষেনেক।' ২।=কি। ৩।=পোষা। ৪।=ছিল। ৫।=বেতাল। ৬।=ডাকিয়া। ৭।=দিলেক। ৮। মূলে 'জন্মা।' ৯। মূলে 'মহাঁরাজ।' ১০।=একি। ১১।=নাই। ১২।=শুনহ। ১৩।=ছিল। ১৪।=গিয়াছিল। ১৫।=কিনারায়। ১৬।=মাইয়া, মেয়ে। ১৭।=আসিয়াছিল। ১৮। মূলে দাঁড়ি চিহ্ন আছে। ১৯। অর্থ 'বাধ্য হইয়া' (?)। ২০।=থাকিল। ২১।=মূলে 'স।' ২২। মূলে 'সাক্ষ্যাত।' ২৩। মূলে 'মালিনি।' ২৪।=মূলে 'ফোলিয়া ফেলিয়া।' ২৫।=দিয়া। ২৬।=বাঁধিয়া। ২৭। মূলে 'বেহার।' ২৮।=ছিঁড়িয়া। ২৯।= পালাইয়া। ৩০।=কাটিয়া। ৩১।=শুনি। ৩২।=যে।

মালিনীর১ কিছু দোস নাঞী।" কন্যা একথা সুনিয়া২ আপনার খাট দুর করিয়া (।) ফেলিয়া দীলেক। মাটীতে শয়ন করিয়া রহিল। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কহিতে লাগিল, "কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম৩, কন্যা তাহা গোষা৪ করিয়া ফিরিয়া দীলেন৫। এ ঘরে আর কেহোও৬ আছহ?" তাল বিতাল উত্তর দীলেক, "কেনো৭ মহারাজ।" পরে রাজা কহিলেন, "কে তুমি?" তাল বিতাল কহিলেক, "আমি রাজকন্যার পরিধেয় বস্ত্র।" "বড়ই ভালো হইল, কথা সুন।৮ এক দেশে এক সওদাগরের কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা চারি জনের সঙ্গে হইয়াছে। বিবাহের দিনে চারি জন আশীয়া৯ উপস্থিত১০ হইল। কেহ বলে, 'আমি বিবাহ করিব,' আর কেহ কহে, 'তুমি কে? আমি করিব।' এই কথায় বড়ই ঝকড়া১১ হইল। সে কন্যা এ কথা সুনে১২ রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মরিলেক। প্রাতঃকালে সে কন্যাকে বাহিরে আনিলেক।১৩ চারি জনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক। এক জন কন্যার শোকে জহর খাইয়া মরিল। এক জন ফিরে ঘরে গেল। একজন বসীয়া১৪ থাকীল১৫।২ এক জন এক ঔবধ খাওইয়া১৬ দুই জনকে বাঁচাইলেক। বল সুনি১৭ কন্যার কাপড়, সে কন্যা কে পাইবে?" তাল বিতাল১৮ কহিলেক, "জে১৯ ফিরা২০ ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক।" কন্যা একথা সুনিঞা২১ কাপড় ফেলিতে পারেন (।) না, হাসিয়া উঠিলেন। কথা কহিলেন। রাজা কন্যার হাত ধরিয়া আপনার খাটে লইলেন। সারা রাত্র হাসিখুসি করিলেন। তার পর দিন ভোজরাজা কন্যার বিবাহ দীলেন২২ (।) রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে।

গল্পটির ভাষা সুন্দর, ঝরঝরে। লেখক পশ্চিমবঙ্গের বলিয়াই বোধ হয়। 'জন্যা', 'ফিরা' এই শব্দ দুইটি 'জন্যে', 'ফিরে' এই শব্দ হইতে শুদ্ধীকৃত রূপ বলিয়া বোধ হয়। বন্ধনীস্থিত বাক্য বা **parenthesis**এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। পর পর দুই বাক্যে একই কর্তৃপদ থাকিলে পরের বাক্যে কর্তৃপদের অনুল্লেখও লক্ষণীয়। 'তাহার', 'তুমি, 'তাহাকে' প্রভৃতি সর্বনাম

১।=মূলে মালিনির।' ২।=শুনিয়া। ৩।=কহিতেছিলাম। ৪।=গোঁসা। ৫।=দিলেন। ৬।=কেহ। ৭=কেন। ৮।=শুন। ৯।=আসিয়া। ১০। মূলে 'উবিস্থীত।' ১১=ঝগড়া। ১২।=শুনে। ১৩।=মূলে দাঁড়ি চিহ্ন আছে। ১৪। =বসিয়া। ১৫।=থাকিল। ১৬।=খাওয়াইয়া। ১৭।=শুনি। ১৮।=বেতাল। ১৯।=যে। ২০।=ফিরা, ফিরিয়া। ২১।=শুনিয়া। ২২।= দিলেন।

পদ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভাষার প্রাচীনতা সূচনা করে। যে কাগজে গল্পটি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোন সন তারিখ না থাকিলেও হস্তলিপি দৃষ্টে এবং ভাষায় আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে রচনাটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝির এদিকে নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় নিজেদের সাধনপ্রণালীর উপর বই লিখিতেন। প্রথমে এইরূপ বই পদ্যে লিখিত হইত। পরে, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ হইতেই, গদ্যে বা মিশ্র গদ্যে পদ্যে এই সকল পুঁথি রচিত হইত। এইরূপ কতকগুলি পুঁথি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কতক-গুলি বৈষ্ণব মহান্তের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। খুব সম্ভব এইগুলি এত প্রাচীন নহে। সপ্তদশ শতকে লিখিত কোন অনুলিপিও পাওয়া যায় না, তবে ভাষার ভঙ্গিটি হইতে অনেক সময় ইহাদের রচনাকালের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যায়। গদ্যে লিখিত এই সব গূঢ়তত্ত্ব সংবলিত পুস্তক গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত। বাক্য ছোট ছোট; ক্রিয়া পদ প্রায়ই উহ্য থাকে। বাক্যে পদের পারম্পর্য্য অনেক সময় বিপর্য্যস্ত দেখা যায়, তাহার কারণ যে অজ্ঞান বা অক্ষমতা তাহা নহে। গদ্যের ভিতর পদ্যের ছন্দ বা তাল আনিবার চেষ্টা। যেমন—

মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়? ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে।

অষ্টাদশ শতকের লেখা গ্রন্থে বাক্যরচনার জটিলতা পর পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব সাধকদিগের লেখায় অসমাপিকার অপপ্রয়োগ নাই, পদের বা বাক্যাংশের অযথা ব্যত্যাসও নাই। একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সরল বাক্যের প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে। ক্রিয়াপদের মধ্যে কেবল ভবিষ্যৎ কালের রূপে কিছু কিছু আধুনিক রূপ পাওয়া যায়। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ অথবা দুর্বোধ্য নহে, বরং

গাম্ভীর্য্যময় ও ওজস্বী। নিম্নে এইরূপ একটি গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অজ্ঞানী জীবে কহে এখন বুঝিলাম কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন বায়ু ভূতের স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না।

এই রচনাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙ্গালায় সাধুভাষার গদ্যরীতি সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে সাহিত্যে গদ্যে এই সম্পূর্ণাঙ্গপ্রায় রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ভিক্ষুক বৈষ্ণবের রচিত ও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ও 'ভদ্র' সমাজের নজরে পড়ে নাই। ফলে সাধুভাষায় সাধারণ সাহিত্যের গদ্যের উৎকর্ষ সাধন হইতে আরও পঞ্চাশ বৎসর বেশী লাগিয়া যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাহিরে এবং পণ্ডিতদিগের সাহায্য ব্যতিরেকেও যে বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল তাহার একটি প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বক্‌সী, এম্-এ মহাশয়ের সৌজন্যে আমি একটি পুঁথি পাইয়াছি। এই পুঁথিতে রামায়ণের কাহিনী ( অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ) সুন্দর সাধুভাষায় বর্ণিত আছে। লিপিদৃষ্টে অনুমান হয় যে পুঁথিটি ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের এদিকে নহে, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে লিখিত। পুঁথিটির ভাষার নমুনা হিসাবে কিছু তুলিয়া দিলাম।

ধনুর্ভঙ্গকালে শীতার উৎসাহবর্দ্ধন কারণ রামচন্দ্রকে লক্ষণ এই বাক্য কহিতেছেন্। প্রভু রঘুনাথ বহুতর চিন্তাতে কিঞ্চিৎ আবশ্তক নাই তুমার দাস আমি সম্মুখে বিত্তমান্ আছি।

যদ্যপি কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি হয় তবে সুমেরু-প্রভৃতি যে পর্ব্বত তাহাকে গণনা করি না ৷ অতএব জীর্ণ শিবধনুকে উথাপন করা চালন্ করা নম্র করা ভগ্ন করা আশ্চর্য্য নহে প্রভু ॥ [ ২ ক ]

তদনন্তর ক্রোধযুক্ত হইয়া পরশুরাম রামচন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন্ যে ওরে রামচন্দ্র তুই ভগবান্ স্বরূপ অতএব তুর সহস্র হস্ত হইয়াছে আমার হস্তদ্বয় তুই মহারাজ আমি মুনির সন্তান্ তুর সৈন্যগণ নিকটে বিদ্যমান্ আছে আমি একক হইয়াছি তথাপি তুর সহিত আমার সংগ্রাম হক সূর্য্যদেব দর্শন করুন্ ॥ [ ৩ ক ] ।

রামচন্দ্র রাবণকে সৈন্য সহিত নষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য সমর্পণ করিয়া রাক্ষসগণ বানরগণ সকলের বন্দিত হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সৈন্যসকলের সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যা পুরীকে আগমন্ করিলেন্ তদনন্তর সীতার সহিত লক্ষণের সহিত এবং আত্মীয় বন্ধু সকলের সহিত রাজ্যভোগ করিতেছেন্ ॥ [ ৬ খ এবং পুঁথির শেষ ] ।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন

সাহিত্যিক গদ্য রচনার প্রচেষ্টা খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের গোড়া হইতে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আশ্রয়ে নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। যাঁহারা এই নূতন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর বৈষ্ণব গদ্য সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল, সেই কারণ, হয় তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বা ইংরেজির আদর্শ গ্রহণ করিতে হইল, অথবা নিজের মনগড়া ছাঁদে সংস্কৃত, আরবী-ফারসী, সাধুভাষা ও কথ্যভাষার খিচুড়ী করিয়া এক অদ্ভুত গদ্যের সৃষ্টি করিতে হইল। তখনো পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যবহারোপযোগী ব্যাকরণ লিখিত হয় নাই, সুতরাং এই নূতন গদ্য-স্রষ্টাদের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা মূলতঃ কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পথ অনেকটা সুগম ছিল, এবং তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের—ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক-দিগের সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি।

রামরাম বসুর রা জা প্র তা পা দি ত্য-চ রি ত্র ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভাষা বড়ই অদ্ভুত রকমের; ইহার জন্য তখনকার ভাষা দায়ী নহে, দায়ী গ্রন্থকার ও তাঁহার অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান। তৎসম শব্দ অনেক ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু তৎসকল অপপ্রযুক্ত ও বানানদুষ্ট। তদ্ভব শব্দকে অনেক সময় ভ্রান্ত

তৎসম রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন 'গাত্র মোচন' ( =মোছা ) করিতে-ছিলেন' ইত্যাদি। 'পদার্পণ হইলেন' ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদেরও যথেষ্ট অপপ্রয়োগ আছে। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা অনেক ক্ষেত্রে '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত হেতুবাচক অতীত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'করিতেছেন' 'করে' (=করিতে লাগিলেন ), 'হইয়াছিল না' (=হয় নাই), ইত্যাদি অসাধু প্রয়োগও নিতান্ত কম নহে। তবে ইহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ দায়ী করা সঙ্গত নয়, কারণ সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারের বাঁধাধরা নিয়ম তখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ক্রিয়মাণ বর্ত্তমান ( present progressive ) তখনকার দিনে প্রায়ই ( বিশেষ করিয়া কোন ঘটনা বা গল্পের বর্ণনায় ) সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহার হইত। বিধিলিঙের অর্থে এখন আমরা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু রামরাম বসুর পুস্তকে ঐ অর্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদেরই প্রয়োগ হইয়াছে। 'আসিয়া', 'যাইয়া' এই দুই পদের ক্রিয়াপদের সহিত নিরর্থক ( enclitic ) প্রয়োগ খুব লক্ষণীয়।

'অস্তি' বা 'ভবতি' বাচক ক্রিয়াপদ প্রায়ই বাক্যমধ্যে বা বাক্যশেষে লুপ্ত করা হইয়াছে, ইহাতে সম্পূর্ণ বাক্যকে বাক্যাংশের সহিত গোলমাল করিয়া দিয়াছে। রা জা প্র তা পা দি ত্য-চ রি ত্রে র দুর্ব্বোধ্যতার ও অদ্ভুতত্বের প্রধান কারণ হইতেছে বিধেয়বিশেষণ, কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারক এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যাংশের ক্রিয়াপদের পরে প্রয়োগ। কর্ত্তৃপদও অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাক্যমধ্যে অসংপৃক্ত বাক্যান্তরের ( parenthesis-এর ) প্রয়োগ ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙ্গালা গদ্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ রামরাম বসুর পুস্তকে এত বেশী করা হইয়াছে যে, পাঠককে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, রামরাম বসুর পুস্তকে দেখা যায় যে, ভাষা সরলতর হয় নাই, উপরন্তু জট আরও বেশী করিয়া পাইয়াছে।

'কহ' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ কিছু বাড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ইহার অর্থের স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

রা জা প্র তা পা দি ত্য-চ রি ত্রে সম্ভ্রমার্থক মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনাম পদ 'আপনি' শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালাতে হিন্দী ভাষা হইতে আসিয়াছে।[১] অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তৎসত্ত্বেও ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, এমন কি তাহার পরেও, সম্ভ্রম জ্ঞাপনার্থ 'আপনি' শব্দের সহিত 'তুমি' শব্দেরও প্রয়োগ যথেষ্ট হইত।

রামরাম বসুর লিখিত গদ্যের নমুনা স্বরূপ রা জা প্র তা পা দি ত্য-চ রি ত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এই মতে কতকাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুণানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অধিক ক্ষমতাপন্ন।

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তিদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে উৎখাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের ক থো প ক থ ন ও[২] প্রকাশিত হয়। এই বইটির রচনাকার্য্যে কেরি কতিপয় দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্য

১। *Origin and Development of the Bengali Language*, পৃঃ ৮৪৬-৮৪৮ দ্রষ্টব্য।

২। *Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language*. By W. Carey D. D. খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ অবলম্বনে এই আলোচনা করা হইতেছে।

লইয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কেরির কত দূর দখল ছিল তাহার সাক্ষ্য এই পুস্তকে প্রচুর পাওয়া যায়। এক হিসাবে কেরিকে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। যাহা হউক, এখন ক থো প ক থ ন-এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থে সাধুভাষা এবং চলিতভাষা দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চলিত ভাষায় লিখিত প্রস্তাবগুলির ভাষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল। ইহাতে অনুমান হয় যে, এইগুলির রচনায় কেরি দেশীয় লোকের বিশেষ সাহায্য লইয়াছিলেন। আর চলিতভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলির মধ্যে মধ্যে একাধিক অঞ্চলের কথ্যভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'তিয়রিয়া কথা' শীর্ষক সন্দর্ভটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহার ভাষা মুলতঃ হাবড়া হুগলি অঞ্চলের উপভাষা। 'হাড়ে', 'আতি', 'কড়ে' ইত্যাদি রূপে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-ভঙ্গির ছাপ রহিয়াছে, এগুলিকে উপভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। 'করিছে' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে শুদ্ধীকরণের চেষ্টা দেখা যায়।

হাড়ে (=হারে)১ ভেগো মাচকে যাবি কিনা (,) আতি (=রাতি) তো কোয়া কোয়া করিছে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

বা এক কাপ কড়ে (=করে) আইয়াছে। হাঁা ম্যাগ পড়েছে এখন কি জালে যাবাড় (=যাবার) সময়। যা চেঁদে তুই (,) মুই তো এখন যাব না। কালি ঢেড় (=ঢের) আতি থাকতে গিয়াছিনু। যাড় বলে থাবার মাচ পেনু না (,) তাতো আজি ম্যাগ পড়েছে।

হাড়ে ভাই ম্যাগের ভয়ে মোদের কাম চলে না। ত্যাবে তো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেখি সুকবাসের (='সুখ বাসা'র) শড়ীল হইয়াছে।২

সাধুভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলিতেও কেরি মাঝে মাঝে কথ্যভাষার রীত্যনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে গদ্যের ভাষায় বৈচিত্র্য সম্পাদিত

১। বন্ধনীস্থিত অংশ প্রবন্ধকারের সংযোজন।

২। পৃঃ ৫৬।

হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করায় ভাষার গৌরবহানি ঘটিয়াছে, যেমন 'সারথিকে ( =কোচম্যানকে ) হুকুম দেহ'; 'মদিরা আমার সঙ্গে খাইবা'।

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি '-কে', '-রে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সম্ভ্রমার্থক 'আপনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহাশয়' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। সামান্য অতীত অনেক সময় সম্পন্ন অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। '-বা' প্রত্যয়ান্ত তুমর্থ বা চতুর্থ্যর্থক শব্দের পরিবর্ত্তে '-অন ( -ওন )' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বাক্য মধ্যে অসংপৃক্ত বাক্যান্তরের ( parenthesis-এর ) প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সামঞ্জস্যহীন দুই বা তদধিক বাক্যের সংযোজন খুবই কম। মোটের উপর বলিতে গেলে ক থো প ক থ ন-এর গদ্যে জটিলতা আদৌ নাই। নিম্নে উদ্ধৃত 'ঘটকালি' শীর্ষক সন্দর্ভটি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল। সেই সময়ের সাহিত্যের গদ্যরচনার সহিত তুলনা করিলে ইহার ভঙ্গি অনবদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে বন্ধনীমধ্যে বিরাম-চিহ্ন বসাইয়া দিলাম।

ঘটক মহাশয় (,) আমার বড় পুত্রুডির বিবাহ দিব (;) আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন (;) বিস্তর দিবস গৌণ না হয় (,) বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাহে। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব১ (;) এখন না হইলে যে খরচ পত্র আনিয়াছি সে২ ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় (,) তাহার ঠেক কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে (;) যেথানে বলেন সেইথানে স্থির করিয়া আসি। কুলীনগ্রামে হরিহর বসুর একটি কন্যা আছে (;) সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ (,) যেন দুদে আলতায় গোলা (;) আর কর্ম্মাও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

---

১। সপ্তদশ শতকের শেষ হইতেই ভবিষ্যৎ কালের সংক্ষিপ্ত ( contracted ) রূপ সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দোম্ আন্তনিও ও আসসুম্পসামের লেখায় ইহা দেখা যায়।

২। 'তাহা' এই অর্থে 'সে' এই সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন রীতির অনুযায়ী।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে (;) তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস (;) আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।

ঘটক যাইয়া হরিহর বসুকে বলিতেছেন (:) বসুজা মহাশয় হে (,) তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য (;) তাহারা জাত্যংশেও যেমন আর অন্ন যোগ স্বচ্ছন্দ আছে (;) সে ব্যক্তি নিজে বয়েহাঁ চাকুরা। পুত্রডি অতি সুজন (,) লিখিতে পড়িতে মূর্ত্তিমন্ত (,) দৃশ্য ভব্য সভ্য (,) অল্প বয়স (;) এমন পাত্র আর পাবা না (,) ইহা বুঝিয়া জবাব দেহ (;) কিন্তু তাহারা দেরি সহিবে না (,) এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে।

আমার এ কার্য্য অবশ্য করা বটে (,) কিন্তু এ মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না (।) যদি অগ্রহায়ণাদিতে কার্য্য করেন তবে আমি পারি (,) নতুবা হয় না।

শুনহে বসুজা (,) এমন বর আর মিলিবে না (।) তুমি যদি কর এমন হয় (,) তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি (।) তাহা বল (;) আমি তাহাদিগকে আনিয়া পত্র করিয়া যাই।

ভাল। যাও আন যাইয়া (।) এই মাসের দশঞি এক দিন আছে (;) তোমরা পরসু তাকাতি আইস।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বসিলেন (।) পত্রাদি লেখাপড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাগ্দান করিলেন।

তোমরা সকলে শুন (:) ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল (।) যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশঞি রোজ দেড় প্রহর রাত্রির পর বিবাহ হবেক।

বর কর্ত্তাও বলিলেন (।) তোমরা শুন (:) ইহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইল (;) যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে তবে হবে (।) উনিও আয়োজন করুন গা আমিও করি গা।[১]

ক থো প ক থ ন প্রকাশের এগার বৎসর পরে (খ্রীষ্টীয় ১৮১২ সালে) কেরির ই তি হা স মা লা প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা সরল বটে তবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের মত নহে। ইহাতে সাধুভাষার প্রতি কেরির ক্রম-বর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা বোধ হয় ফোর্ট উ ই লি য়া ম কলেজের আবহাওয়ার দরুন। কেননা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়ও

১। পৃঃ ৪৮, ৫০, ৫২।

দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সাধুভাষার প্রতি পক্ষপাতিতা এবং সেই হেতু ভাষার কৃত্রিমতা ও জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেরির এই বইখানিতে মধ্যে মধ্যে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অ-সমানকর্ত্তৃক (absolute) প্রয়োগ এবং বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণমূলক বাক্যাংশের (adjectival and adverbial clauses and phrases-এর) বিপর্য্যস্ত প্রয়োগ ছাড়া ব্যাকরণঘটিত অন্য জটিলতা বিশেষ কিছু নাই। 'করিলেক' ইত্যাকার ক্রিয়া পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

গোলোকনাথ শর্ম্মা কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদও খ্রীষ্টীয় ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়।[১] এই পুস্তকের বাক্যবিন্যাসরীতি হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী। জিজ্ঞাসার্থক সর্ব্বনামের যুক্ত প্রয়োগ এই গ্রন্থের ভাষার অনন্যসুলভ বিশেষত্ব।[২] অসম্পন্ন বর্ত্তমান সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোলোকনাথের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

> অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় ( ; ) অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় ( , ) তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে ( । ) যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না ; অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় (,) যেমন হংসের মধ্যে বক।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখকদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান খুবই উচ্চে, এমন কি সর্ব্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইনি চারিখানি গ্রন্থের রচয়িতা—ব ত্রি শ সিং হা স ন, রা জা ব লী,

---

১। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩০।

২। যেমন, 'কোন কাহারও মুখে শুনিলেন।'

৩। বন্ধনীমধ্যস্থ বিরাম-চিহ্ন প্রবন্ধকার প্রদত্ত।

হি তো প দে শ১ ও প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা। ব ত্রি শ সিং হা স ন ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়, রা জা ব লী ১৮০৮ সালে ও প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা ১৮৩৩ সালে।২

মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে সাধুভাষার ও সংস্কৃত রীতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ গদ্যের ভঙ্গি সরলতা হইতে জটিলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল।

ব ত্রি শ সিং হা স নে র ভাষা বেশ সরল। 'ছিল' অর্থে 'হইয়াছিলেন', 'থাকে' ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্টই আছে। শীলার্থ অতীত ( **habitual past** )-এর স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ খুবই লক্ষণীয়। সংযোজক অব্যয় 'ও', 'এবং'-এর ব্যবহার খুবই বেশী। 'যে' শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ-উক্তি ( **direct speech** ) সুরু করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।

রা জা ব লী খ্রীষ্টীয় ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহা প্রকাশের তিন বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে রচিত হয়।৩ এই গ্রন্থে আরবী ফারসী শব্দ যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে। রা জা ব লী র ভাষা মোটামুটি সরল, তবে সংস্কৃতমূলক জটিল রীতি স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ যে করে নাই তাহা নহে। রা জা ব লী র রচনা-রীতির নমুনা হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গোরের বাদশাহ গয়াসুদ্দিন যবনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন হিজরি ৫৬৯ সনে আপন বিক্রমে গজনেন অধিকার করিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মুলতান দেশ

১। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে হি তো প দে শ খ্রীষ্টীয় ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। লং ( Long ) সাহেবের মতে ইহা ১৮০১ সালে প্রকাশিত] *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য।

২। সুশীলবাবু অনুমান করেন যে প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা খ্রীষ্টীয় ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ছাপা হইয়াছিল।

৩। বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৭।

জয় করিয়া তথায় আপনার জনেক অন্তরঙ্গকে নায়েব করিয়া রাখিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। তাহার পর দ্বিতীয় বারে ৫৭০ হিজরি সনে রেতস্থান দিয়া গুজরাট দেশে আসিলেন, সে দেশে রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া গজনেনে পলাইয়া গেলেন।

রা জা ব লী-র অধিকাংশই এইরূপ সুখপাঠ্য সরল রীতিতে লিখিত।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠচিত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত হইতেন, এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন, এ দুষ্ট কুজ্ঞানী পরদার-মাত্র-নিষ্ঠ-চিত্ত হইয়া নির্লজ্জ ছিল, অতএব দিগম্বর হইয়াছিল, এবং সাংসারিক যাবৎ বিষয়েতে পরম বৈরাগ্য সম্পন্ন সাধুপুরুষেরা ভস্ম বিভূষিত হইতেন, এই ভ্রষ্ট কুযোগী বেশেতে বৈরাগী, কিন্তু ব্যবহারেতে মহারাগী ছিল, এমন লোকের মুখে ছাই উপযুক্ত হয়, অতএব আপনি মুখে ছাই মাখিত।১

এই অংশটির রীতি সংস্কৃতানুগ হইলেও সরলতার ও সুবোধ্যতার কিছু-মাত্র হ্রাস হয় নাই।

হি তো প দে শ-এর ভাষা খুবই সংস্কৃতানুগ, প্রায় প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা র মতই। ইহার ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভাবার্থক বিশেষ্যপদের কর্ম্ম কারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ ( যেমন, 'মতি সমতাকে পায়' ) আর বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের অব্যবহিতপূর্ব্বে গৌণকর্ম্ম এবং তাহার পূর্ব্বে মুখ্যকর্ম্মের প্রয়োগ।

প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্র বো ধ-চ ন্দ্রি কা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার মধ্যে তিনি অনেক বিষয় এবং অনেক রীতি দেখাইয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ নবাগত সিভিলিয়ান সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্য গ্রন্থকার এই বইটির মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছু ঢুকাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা আমাদের নিকট তুচ্ছ অথবা অবান্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা ও রচনার বিভিন্ন ভঙ্গি বইটিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।

---

১। রা জা ব লী হইতে উদ্ধৃত এই অংশ দুইটিতে যে কমা ( comma ) চিহ্ন আছে তাহা বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই মনে হয়।

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে—(১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং (৩) সংস্কৃত-রীতি। মৌখিক রীতি কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় অথবা সর্ব্বলোকের বোধগম্য করিবার জন্য কতকগুলি মাত্র বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধুরীতিতেই পুস্তকখানির অধিকাংশ রচিত। সংস্কৃত রীতি কেবল সংস্কৃত হইতে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক বা আলঙ্কারিক তথ্যে বা বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এ যাবৎ প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই তৃতীয় রীতিকে এই পুস্তকখানির মূল রচনারীতি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রীতি কেবল বিদেশীয় ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক ভাষার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কথ্যভাষা-মূলক রচনা অংশ স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ম্বর। স্থানে স্থানে অবশ্য (এখনকার রুচির হিসাবে) অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু রচনার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি সাধনই করিয়াছে। মার্শম্যান (Marshman) সাহেব প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা র ভূমিকায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, ইতর শ্রেণীর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে সরসতার (humour) সঞ্চার করিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন।[১] এই রকম রচনার মধ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় ইতরশ্রেণীর কথ্যভাষাকে কতক অংশে জোরাল করিয়া রচনারীতিকে তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা যথেষ্ট

১। The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower order, the vulgarity of which however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour.

শক্তিমত্তার পরিচয়। এই রীতির উদাহরণ হিসাবে এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

পুত্রস্নেহে অস্তব্যস্তা হইয়া মহারাজ মাতা কুন্তী মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, ওলো দাসীরা! দেখ তো সে সর্ব্বনাশে অল্পায়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ খেংরা, কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জন তর্জ্জন ভৎ´সন করত, রে রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! স্ববংশ পাংশুল রণকাতর যুদ্ধ পরাঙ্মুখ নির্ল্লজ খট্টারূঢ় বালীক নিঃসাহস সহিস কুড়িয়া বেটা! তোর নিমিত্তে আমাদের ভীম,—মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠা জ্যেঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাসুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহায়ী, বেহানী, শালা, শ্যালী, ভাউজ, ভাইবউ, ভাএরা ভাই, ভাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতাত্যাগে অপারক হইয়া, তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্। ছি! ছি! ধিক্ তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন। ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে কুক্ষণজন্মা! তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোল্লায় যা, চুলায় যা, মার্‌তো বাঁ-পাতে, নাতি মার, ঝাটা মার, জুতা মার, বেত মার, তোর জন্মে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ, এবম্বিধ বহুবিধ কটুকষায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।১

প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা-য় সাধু বা সাহিত্যিক রীতির মধ্যে দুইটি ধারা আছে —একটি সরলতর অপরটি জটিলতর। সরলতর ধারাটি কাহিনী বা বর্ণনায় (narration-এ) অনুসৃত হইয়াছে, আর জটিলতর ধারাটি বিবরণে (description বা statement-এ) অবলম্বিত হইয়াছে। এই দুইটি ধারার উদাহরণ পর পর দেওয়া গেল।

[১] অতিবড় দরিদ্র এক ব্যক্তি থাকে তাহার নাম সেকচিল্লি। সে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইয়া কুক্কুট-কুক্কুটী এক যোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া নক্রচক্রাকুল অতিশয়

১। প্র বো ধ চ ন্দ্রি কা হইতে উদ্ধৃত সকল অংশই বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে। কমা (comma) ও বিস্ময়-চিহ্ন মূলে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হয় মার্শম্যান নয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

স্রোতোগভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল।—তাহা বেচিয়া ছাগছাগী ও ভেড়াভেড়ী কিনিব, তাহারদেরও বৎসবৎসা যথেষ্ট হইবে, সে সকল বাচ্চাবাচ্চি ও তারদের দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহাতে গরু বলদ মহিষ ক্রয় করিব, তাহাতে বয়ার ও দুগ্ধ দধি ঘৃত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহাদের চর্ম্ম ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও বলীবর্দ্দেতে চাস করিয়া সে শস্য পাইব, তাহার বিক্রয়ণে বহু টাকা কড়ি পাইব।—তাহাতে ঘোড়া-ঘোড়ী অনেক কিনিব, তাহারদের বাচ্চা বিক্রয় করিব, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি হইবে। তদনন্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া পরম সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যাতে ঐ ভার্য্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সূপকার অন্নব্যঞ্জন পরমান্ন কৃষর, অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া যখন আমাকে ডাকিবে যে কর্ত্তা মহাশয়! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি কহিব, যা বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না।

এইরূপে মনে মনে করত যেমন মাথা নাড়া দিয়াছে, তেমন ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরগ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল।

[ ২ ] অতএব ইদানী ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্কপটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয়, অন্যথা বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্ত কার্য্যারম্ভে নিষ্কম্পাপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট। যদ্যপি অন্যোন্যে বাধাবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজনবিশেষে সমবায়ে তৈলবর্ত্তি-শিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির ন্যায় অর্থসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব উভয় বিশ্বাসে পরস্পর সখ্য হইলে পরস্পরের সাহায্যে শত্রু হইতে দুয়ের ত্রাণ সম্ভাব্যমান হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের তৃতীয় অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক রীতি প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রায়ই তৎসম শব্দঘটা ও সমাসপরম্পরা আছে, তাহা হইলেও বাক্যরীতি বাঙ্গালারই, দৈবাৎ দুই এক স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদপ্রণালী বুঝা যাইবে।

হে রাজপুত্র! সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্রশূন্যা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি মুনিকর্ত্তৃক অনুশাসিত স্বয়ংসৃষ্ট যে বাক্য সকল,

তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত্ত হয়। যেহেতুক যদি শব্দনাম জ্যোতি এজগতের শেষ পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধকারময় হইত। দর্পণেতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দেখ বাঙ্ময়রূপ দর্পণের এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান বস্তু সকল, তাহাও দেখা যাইতেছে।

ইহার মূল দণ্ডীর কা ব্যা দ র্শে র এই শ্লোকগুলি—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজধনহংসবধূর্ম্ম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে॥
ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ম্।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥১

কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলনিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরণাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

ইহাও কা ব্যা দ র্শ-স্থিত এই শ্লোকটির অনুবাদ—

কোকিলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ।
উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণোক্ষিতঃ॥২

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। 'দ্বারা' প্রভৃতি কর্ম্মপ্রবচনীয় প্রয়োগ না করিয়া '-তে' বিভক্তির দ্বারা করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। কর্ম্ম কারকের '-কে' বিভক্তি অনেক সময় ভাববাচক (abstract) ও জড়বস্তু-বাচক বিশেষ্যের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুবচনান্ত পদের সহিত পুনর্ব্বার বহুবচনের বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্টই দেখা যায়। (যেমন, স্ত্রীবর্গেরা, পক্ষিসমূহেরা, মুনিগণেরা, ধাত্রীদিগেরা, ইত্যাদি)।

১। প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা ১, ৩-৫।

২। প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা ৪৮।

গৌণকর্ম্মে '-রে' বিভক্তির প্রয়োগ খুবই কম। সম্মানবাচক মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনাম পদ 'আপনি' শব্দের রূপে 'আপনকারা', 'আপনকাকে,' 'আপনকার,' 'আপনকারদের,' ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। 'নিমিত্ত'বাচক 'জন্য' শব্দের প্রয়োগ অল্প। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাতেই এই প্রয়োগ প্রথম মিলিল। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্ত্তে 'পাওত,' 'করত,' 'হওত' ইত্যাদি ক্রিয়ামূলক পদ ও '-পূর্ব্বক' '-করণক' '-প্রযুক্ত' প্রভৃতি পদের দ্বারা সমাস-যুক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শীলার্থ অতীতের ( habitual past-এর ) স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ বেশ আছে। '-তে' প্রত্যয়ান্ত ভাববচন, '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে ( যেমন, 'কিন্তু সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল নহে' )। 'রহ' ধাতুর পরিবর্ত্তে 'থাক' ধাতুর প্রয়োগ ; 'পারিয়াছিল না,' 'না হও' (=হইও না), 'হও না' (=নহ) ইত্যাদি প্রয়োগ ; আরম্ভ বুঝাইতে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ ; লাজা ( লাজ শব্দের বহুবচন,=খই ) কীশ ( =বানর ), অপত্রপা (=লজ্জা), কহ্ব (=বক), শব্দের অক্রবাণ ( =বাক্যহীন ), একপদে ( =শীঘ্র ) ইত্যাদি অপ্রচলিত তৎসম প্রয়োগ ; 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাক্যসমূহের সংযোজন ( যথা, 'স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগ করিয়া নব্য লোকেতে অনুরাগ যে করে তাহার ভাল হয় না ও স্বামীদ্রোহ যে করে, সে দুরবস্থা-প্রাপ্ত অবশ্য হয়, ও ভাবী আশ্রয়কে সম্যক পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিবে না' ) ইত্যাদি তৎকালোচিত বিশেষত্বের অসদ্ভাব মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় নাই।

গিলখ্রিষ্ট (Dr. J. Gilchrist) সাহেবের তত্ত্বাবধানে খ্রীষ্টীয় ১৮০৩ সালে ইংরেজি হইতে ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সমেত ঈশপ্‌স্ ফেব্‌ল রোমান হরফে প্রকাশিত হয়।[১] বাঙ্গালা অনুবাদ অংশ তারিণীচরণ মিত্র রচিত।

---

১। *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৮৫।

বইটির ভাষা সরল ও সুবোধ্য তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজির রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহা হইতে একটি গল্প[১] উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল এক টুকরা পোনীরের আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁকশিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতিঃ, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার আর আর গুণের সমান বটে। আনন্দোন্মত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে ভুলিয়া তাহাকে আপন স্বরের পরিপাটি দেখাইবার জন্যে মুখ খুলিলেক তখন পোনীর নীচে পড়িল, তাহা তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিল, আর দাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা গরিমায় খেদ করিতে রাখিয়া গেল।

ইহার ফল এই, যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।

এই পুস্তকেই বোধ হয়, দেশীয় ভাষার পক্ষে ইংরেজী বিরাম-চিহ্নের প্রথম প্রয়োগ।

হরপ্রসাদ রায়ের পু রু ষ-প রী ক্ষা[২] খ্রীষ্টীয় ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত পু রু ষ-প রী ক্ষা নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই পুস্তকের ভাষার বিশেষত্ব এইগুলি। বিশেষণ পদকে 'যে সে' শব্দের দ্বারা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে ( যেমন, 'নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয় )। '-ইয়া ও '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে 'করত' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ। '-করণক' শব্দের সহিত সমাস করিয়া করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা। একই বাক্যের মধ্যে সম্ভ্রমসূচক 'তুমি' ও 'আপনি' শব্দের

১। ঐ, পৃঃ ১৮৬-৮৭।

২। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। উহাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার রচনারীতি মৃত্যুঞ্জয়ের রীতির অনুযায়ী নহে। ১৮৩০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের স মা চা র দ র্প ণেও ইহা হরপ্রসাদ রায়ের রচনা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

প্রয়োগ ( যেমন, 'হে ভূপাল, তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিলেনও না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে···আপনি কিছু ভয় করিবেন না )। একটি খুব লক্ষণীয় প্রয়োগ হইতেছে 'কহ্' ধাতুর স্থলে 'বল' ধাতুর প্রয়োগ। এইরূপ প্রয়োগ অবশ্য অল্প স্থলেই করা হইয়াছে। অন্যত্র 'বল' ধাতুর প্রয়োগ যদিও পাওয়া গিয়াছে, তথাপি তথায় ইহার অর্থের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, সেখানে 'বল' ধাতুর অর্থ ইংরেজি ক্রিয়া tell-এর ন্যায়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে প্রয়োগ খুবই অল্প। 'বটে' এই ক্রিয়াপদ জিজ্ঞাসাসূচক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হইয়াছে ( যেমন, 'হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে' )। একাধিক বাক্যের পর ছেদচিহ্ন স্থাপন প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব বটে, কিন্তু পু রু ষ-প রী ক্ষা-য় ইহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে[১]।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে রাজা রামমোহনের স্থান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরেই। রামমোহনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা খ্রীষ্টীয় ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক বে দা ন্ত গ্র ন্থ ১৭৩৭ শক অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামমোহন সাহিত্যিক রচনা বিশেষ কিছু করেন নাই, তাঁহার লেখা প্রায় সবই তর্ক বা বিবাদমূলক অথবা শাস্ত্র ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয়। তথাপি তাঁহার হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কিছু পরিমাণে শক্তি লাভ করিয়াছিল। তবে তখনকার দিনের বাঙ্গালা গদ্যের দুর্বোধ্যতা নষ্ট করিবার জন্য রামমোহন বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার সমসাময়িক অনেক লেখকের রচনার অপেক্ষা তাঁহার রচনা যথেষ্ট দুর্বোধ। রামমোহনের গদ্যে কিছু সাহিত্যিক গুণ থাক বা না থাক, ইহা যে তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন না হইলে আমরা বিদ্যাসাগর ও

১। বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩৯-৪০।

বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইতাম কিনা সন্দেহ। রামমোহন এক একটি বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। খুব অল্প স্থলেই তিনি একাধিক বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। এইটি তাঁহার একটি কৃতিত্ব বলা চলে। রামমোহনের ভাষার বিশেষত্ব এইগুলি। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া পদের প্রয়োগ (যেমন, 'কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজ্যপ্রাপ্তি হয়')। 'না' শব্দের ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রয়োগ (যেমন, 'তাহার বিংশতি অংশের অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়') 'করা' এই ভাববচনের পরিবর্ত্তে 'করিবা' এই ভাববচনের প্রয়োগ (যেমন, 'তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন'; 'অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না')। গুণবাচক বা জড়বস্তুবাচক শব্দের কর্ম্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। তৃতীয়া এবং সপ্তমী বিভক্তির -'তে' প্রত্যয় ব্যবহার। গৌণকর্ম্মের পূর্ব্বে মুখ্যকর্ম্মের প্রয়োগ। কর্ত্তৃহীন ক্রিয়াপদের (**impersonal verb**-এর) প্রয়োগ। সংস্কৃত 'হি' এবং 'অপি' এই অর্থে 'ই' এবং 'ও' এই দুই অব্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের অন্ত্য ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত সংযোগ। যেমন, 'তাঁহারি', 'সকলে রো', 'কিঞ্চিতো', 'নামো করেন না', ইত্যাদি)।

রামমোহনের বাঙ্গালা রচনার উদাহরণ হিসাবে নিম্নে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে তাহাতে রামমোহনের সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা যাইবে। তাঁহার নিজের গদ্যের অন্বয় ও অর্থবোধের প্রণালীও রামমোহন ইহাতে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রামমোহনের এই উক্তিটুকু মূল্যবান।

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ

বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমায় অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না।[১]

রামমোহনের গদ্য রচনারীতি তাঁহার সমসাময়িকদিগের রচনারীতি অপেক্ষা জটিল, এবং দুর্ব্বোধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৮২৩ সালে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধবাদিদিগের একটি পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জন দিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতা ও ভগ্নোদ্যম, তাহাতে সরলান্তঃ করণ সজ্জনেরা, সে ভাব কিরূপে বোধ করিতে পারেন, দেখ, ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়, দোষের সান্নিপাতিক বিকার গ্রস্ত হইয়া মদ্য মাংসাদি ভোজনের লোভে ও বিকার শান্তির আশায়, এক্ষণে বামাচার স্বরূপ ঔষধপান করিতেছেন, যেমন, কোন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, রোগ শান্তির বাঞ্ছায় ও কুপথ্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষায়, বিষপ্রয়োগ করে কিন্তু,

১। বেদান্ত গ্রন্থ, অনুষ্ঠান।

তাহাতে রোগ শান্তির বিষয় কি, কেবল বিসজ্বালায় প্রাণ যায়, অধিকন্তু, আত্মঘাতী ও হইতে হয়, ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগেরো তাহাতে সে দোষের শান্তি দূরে থাকুক, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধিই হইবেক অধিকন্তু, ছিলেন, গুপ্ত ভাক্ত বামাচারী ও ব্যক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, এক্ষণে হইলেন, ব্যক্ত ভাক্ত বামাচারী তাঁহার, অভিপ্রায় এই, যে, লোকে, জ্ঞানী ও কহিবেক, অথচ কৌল ধর্ম্ম প্রযুক্ত কেহ নিন্দা করিবেক না, স্বচ্ছন্দে মদ্য মাংস ভোজনাদি ও করা যাইবেক, যেমন, বুদ্ধিমতী বেশ্যা, যৌবনাবস্থার অভাবে দুরবস্থার ভয়ে যৌবনের ক্রোমোপক্রমেই বৈষ্ণবী হয়, তাহার মনের মানস এই, যে, বৈষ্ণবী বলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা করিবেক না, ভিক্ষাবৃত্তি অবাধে হইবেক, বেশ্যাবৃত্তি ও নির্বিঘ্নে চলিবেক, আর্ত্ত হইলে বুদ্ধি ভ্রংস হইয়া লোকের কি ২ দুরবস্থা না হয়, হায় ২ একি অদৃষ্ট, এত কষ্ট, তথাপি না তাঁত্তিকুল, না বৈষ্ণবকুল, এ কুল ও কুল, দুই কুল নষ্ট, যে পথে যান সেই পথেই অনিষ্ট, এক পথে সিংহ, এক পথে ব্যাঘ্র, পুনর্ব্বার যে উভয় ভ্রষ্ট সেই উভয় ভ্রষ্ট। অতএব ভগবদ্গীতা কহেন, যে, জীব, যত্ন পূর্ব্বক স্বয়ং আত্মার উদ্ধার করিবেন, আত্মাকে কদাচ অবসন্ন করিবেন না, সুকৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার বন্ধু ও দুষ্কৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার রিপু হয়েন। যথা। উদ্ধরেদাত্মনাত্মান মবসাদয়েৎ। আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ।১

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। স মা চা র-দ র্প ণ তখনকার দিনের প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিতেছি। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত সং বা দ-প ত্রে সে কা লে র ক থা পুস্তকে উদ্ধৃত অংশগুলি অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা যাইতেছে।

একাধিক বাক্যের পরে ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার হইয়াছে। 'ও' 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা বিভিন্নপ্রকৃতির বাক্যের যোজনা করা হইতেছে। অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ কম। বড় বড় সমাসের ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। -'অন' প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব ভাববচনের প্রয়োগ যথেষ্ট। আরম্ভবাচক 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ।

১। পা ষ ণ্ড পী ড় ন নামক প্রত্যুত্তর, পৃঃ ১২৯-১৩১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে এই পুস্তকটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

'যে' শব্দের দ্বারা মুখ্য উক্তির (direct speech) আরম্ভ। বিধিলিঙের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ। 'বল্' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম। 'আমারদিগের' ইত্যাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রিয়াপদের বিভিন্নকালের প্রয়োগ অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

সংবাদপত্রের রচনার নমুনা হিসাবে ১৮২৫ সালের স মা চা র-দ র্প ণ হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িথড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল। তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদের গায়ে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া এক প্রকার রক্ষা পাইল (।)১

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের আলোচনা এক রকম হইল। এই যুগের অবসান হয় খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। এইবার প্রথম যুগের রচনার বৈশিষ্ট্যের একটা মোটামুটি হিসাব দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

[শব্দরূপ ও প্রয়োগ:] ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের পর '-দিগ', '-দের' বিভক্তির প্রয়োগ। এই প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় ও সর্ব্বাপেক্ষা কম রামমোহন রায়ের লেখায়। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে '-রে' ও '-কে' এই দুই বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলেও -'রে' বিভক্তির প্রয়োগ পর পর কমিয়া আসিয়াছে। গুণবাচক ও জড়বস্তুবাচক বিশেষ্য পদের কর্ম্ম কারকে -'কে'

১। সং বা দ-প ত্রে সে কা লে র ক থা, পৃঃ ৮৬-৮৭।

বিভক্তির প্রয়োগ। 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতি করণকারক-বাচক শব্দের অপ্রয়োগ, তৎস্থলে '-তে' বিভক্তির সুপ্রচুর প্রয়োগ। আধুনিক বাঙ্গালার অনুযায়ী চতুর্থী বিভক্তিতে নিমিত্তবাচক 'জন্য' শব্দের অপ্রয়োগ (—মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় ও তারিণীচরণ মিত্রের লেখায় দুই একবার পাওয়া গিয়াছে)। দুই বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'অপেক্ষা', 'চাহিয়া' প্রভৃতি পদের অপ্রয়োগ ; এই যুগের শেষের দিকে এই অর্থে 'হইতে' শব্দের চলন আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভ্রমবাচক 'আপনি' শব্দের রূপে 'আপনকার','আপনকারদের', 'আপনকাকে,' 'আপনকারা' পদের চলন যথেষ্ট ছিল। 'তুমি' শব্দের সম্ভ্রম-বাচকতা তখনও একেবারে লোপ পায় নাই, কারণ ইহা 'আপনি' শব্দের সহিত একত্রে প্রযুক্ত হইত। আরম্ভ অর্থে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ।

[ ক্রিয়া পদের প্রয়োগ : ] সামান্য অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্ত্তমানের প্রয়োগ। শীলার্থ অতীত ( **habitual past** )-এর স্থলে বর্ত্তমানের প্রয়োগ। 'পারিয়াছিলেন না', 'না হও', ইত্যাকার অপপ্রয়োগ (—ইহার উদাহরণ খুব অল্পই পাওয়া যায় )। সম্ভাবনা অর্থে অনুজ্ঞা পদের সহিত 'যদ্যপি' শব্দের প্রয়োগ। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া (**copula**)-র প্রয়োগ। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে '-অত' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ। 'অর্থ' বা 'পূর্ব্বক' ইত্যাদি শব্দের সহিত সমাস। '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে সপ্তম্যন্ত ভাববচনের প্রয়োগ। 'বল্' ধাতুর প্রয়োগ অত্যল্প ; 'বল্' ধাতুর অর্থ 'কহ্' ধাতু হইতে একটু পৃথক ছিল।

[ বাক্যাংশ ও বাক্যের প্রয়োগ : ] বিশেষণ শব্দ ও বাক্যাংশ ঘুরাইয়া বলা ( **periphrasis** )। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের স্থান বিপর্য্যয়। এক বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক বাক্যান্তর বা বাক্যাংশের স্বাধীন প্রয়োগ ( **parenthesis** )। 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন ধাঁচের বাক্যের সংযোজন। একাধিক বাক্যের পর একটিমাত্র ছেদ-চিহ্নের প্রয়োগ। কমা ( **comma** ) ছাড়া ইংরেজী বিরামচিহ্নের অসদ্ভাব।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম রচনা বা সু দে ব-চ রি ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য খ্রীষ্টীয় ১৮৪১ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়াছিল। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করা যায় নাই বলিয়া পুস্তকটি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বা সু দে ব-চ রি ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনাতেই তাঁহার রচনার প্রায় সকল গুণই কিছু কিছু পরিমাণে বর্ত্তিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার অনুযায়ী বিভিন্ন বাক্যের সংযোজনে 'এবং' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপ ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতি-বান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; অতএব মহারাজ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বসুদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদু বংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানা দেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইয়া মথুরাতে অবস্থান করিলেন।[১]

---

১। বিহারীলাল সরকার প্রণীত বি দ্যা সা গ র, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬১।

বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। বাঙ্গালা সাহিত্য সাধুভাষার পূর্ণাঙ্গরূপ ইহাতে প্রকটিত হইল। বাঙ্গালা গদ্য তাহার জড়তা ও দুর্ব্বোধ্যতা হইতে মুক্তি পাইয়া সাহিত্য-সংসারের প্রাত্যহিক কাজের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধুভাষাকে যে রূপ দিলেন তাহা ইহার স্থায়ী রূপ। সাধুভাষার এইরূপ এখনও বদলায় নাই; বদলাইতে যথেষ্ট দেরীও আছে। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি দিগ্‌দর্শনী। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিমাণ বিচার করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম যুগের গদ্যের একটা প্রধান দোষ ছিল, একাধিক বাক্যের পর একটিমাত্র ছেদ-চিহ্নের প্রয়োগ। রামমোহন রায় এই দোষ অনেকটা কাটাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালা গদ্যের এই দুর্ব্বোধ্যতাজনক দোষ একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি-তে দেখি যে এক একটি বাক্যের পর ছেদ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও এক কথা, পূর্ব্বেকার গদ্যে বিভিন্ন ধাঁচের বাক্য সংযোজক অব্যয় ( conjunction )-এর সাহায্যে গ্রথিত হইত, ইহাতে ভাবের বিরুদ্ধতার দরুন বাক্যের ভারসাম্য ও গদ্যের লালিত্য একেবারেই থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মধ্যে এরূপ দোষের কোন স্থান রহিল না।

বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের ছন্দ ও তাল ধরা পড়ে। গদ্যেরও একটা তাল আছে। একাধিক শব্দ উচ্চারণ করিবার পর শ্বাসবায়ু স্বতঃই এক একবার মন্দীভূত হইয়া যায়, ইহাতেই গদ্যের ছন্দে যতি পড়ে। এই যতি প্রত্যেক ভাষাতেই একটু না একটু পৃথক রকমের। বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেরও এই

রকম যতিমূলক ছন্দ বা তাল আছে।[১] বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের ভাষায় এই তাল অনুযায়ী সুষম (balanced) বাক্য গঠন করিতে আরম্ভ করেন। আমি অবশ্য বলিতে চাহি না যে, গদ্যের এই তাল পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্যসাহিত্যে একেবারেই নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে ইহা ক্বচিৎ মিলে বটে, কিন্তু সেখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইহা রচয়িতার অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে। আর গদ্য লিখিতে গেলে কথ্যভাষার প্রভাব ত আসিয়া যাইতেই পারে। আমার বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সাধুভাষার গদ্যসাহিত্য এই তালমূলক কাঠামোয় দাঁড় করাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত গদ্যের এই ছন্দোময়তা বা তালমূলকতার কিছু উদাহরণ তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একদা, | রাজা বিক্রমাদিত্য | মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ॥ জগদীশ্বর | আমায়, ॥ নানা জনপদের | অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের | হিতাহিত চিন্তার | ভার দিয়াছেন ॥

তাঁহারা | প্রস্থান করিলে, ॥ শকুন্তলা, | সত্য সত্যই | সখীরা চলিয়া গেল, ॥ ইহা বলিয়া | উৎকণ্ঠিতার ন্যায় | হইলেন ॥

হেমকূটের চিরঞ্জীব, | কিঙ্করকে | জাহাজের অনুসন্ধানে | পাঠাইয়া, ॥ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত | উৎসুকচিত্তে, | তদীয় প্রত্যাগমনের | প্রতীক্ষা করিলেন ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যে কমা (comma) চিহ্নের প্রাচুর্য্য বা বাহুল্য দেখা যায়, তাহার হেতু এই ছন্দ বা তাল দেখান মাত্র। অবশ্য অনেক স্থলে যে বোধসৌকর্য্যের জন্যও এইরূপ বিরামচিহ্নের ব্যবহার হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দু র্গে শ ন ন্দি নী-তেও এইরূপ কমা-চিহ্নের অসদ্ভাব নাই। পরে অবশ্য এই চিহ্ন এত অধিক ব্যবহার করা হয় নাই, তাহার কারণ তখন বাক্যরচনার এই স্বাভাবিক রীতি সাহিত্যিকদিগের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language*, পৃঃ ২৯৫ দ্রষ্টব্য।

'-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার সাহায্যে একাধিক ক্রিয়াপদ একই সরল বাক্যে ( simple sentence ) প্রয়োগ করা বাঙ্গালা ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব বলা চলে। কিন্তু পর পর বহু অসমাপিকার প্রয়োগ করিলে রচনার জোর কমিয়া যায়, এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈচিত্র্যের খাতিরে '-পূর্ব্বক', '-অনন্তর' ও '-পুরঃসর' শব্দের সহিত ভাববচন ( verbal noun )-এর সমাস করিয়া অসমাপিকার অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, 'ফল লইয়া, পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া' ইত্যাদি।

সাধারণ লোকের একটা ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় বড় দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। একথা ঠিক সত্য নহে। প্রথম যুগের সাধুভাষায় যে প্রকার সংস্কৃত রীতি ও ভয়াবহ তৎসম শব্দ প্রযুক্ত হইত তাহার কিছুই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায় না। আর এক বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্য কোন রচনায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা অতিশয় অপরিচিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি-তে যাহা আছে তাহাও অল্প, যেমন—'কাদাচিৎক কুব্যবহার', 'মলিম্লুচের নিকট', 'নিকাম ব্যাকুল'। 'সমভিব্যাহার', 'অনুকূলতা' ইত্যাদি শব্দ এখন আমাদের নিকট অপরিচিত হইলেও, এককালে ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর খুবই পরিচিত শব্দ ছিল। এই সকল শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও যথেষ্টই পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যা ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি বহুল পরিমাণে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কথ্যভাষার ছাঁচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মধ্যে যথেষ্টই পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কুত্রাপি লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন—

সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি : কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া, কেমন করিয়া পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে : সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবে।

সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল আপদ্ ঘুচিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ম হা ভা র তে র অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া (১২৬৭ সাল) তিনি এই কার্য্য কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে ছাড়িয়া দেন। ম হা ভা র তে র অনূদিত অংশে অবশ্য প্রচুর তৎসম শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহা থাকিবারই কথা। ম হা ভা র তে র মত গ্রন্থের অনুবাদে ইহা অপরিহার্য্য।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগ করা তখনকার রীতি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায়ও ইহার অন্যথা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যেও ইহা খুবই পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে এই রীতি যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কোচ লাভ করিয়াছিল। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের বিশেষণ বিধেয় (predicate) রূপে ব্যবহৃত হইলে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করেন নাই।

নামধাতুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের রচনায় নাই বলিলেই হয়, কেবল এইগুলি পাওয়া যায়—'জিজ্ঞাসিলেন', 'সম্বোধিয়া', 'প্রবেশিয়া', 'দংশিয়া', 'সম্ভবে'। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি-তে বেশী; শ কু ন্ত লা য় (খ্রীষ্টীয় ১৮৫৪ সাল) ও সী তা র ব ন বা সে (১২৬৮ সাল) 'বল্' ও 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ প্রায় সমান সমান; আর ভ্রা ন্তি বি লা সে 'বল্' ধাতুরই প্রয়োগ আছে, 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।

ভাববচনসংবলিত যুক্ত-ক্রিয়াপদের (compound verb with a verbal noun) প্রয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় একটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা অবশ্য তৎকালিক প্রয়োগরীতি ছিল। এই রীতি অনুসারে যুক্ত-ক্রিয়াপদটির কর্ম্ম কর্ম্মকারক রূপে ব্যবহৃত না হইয়া ভাববচনের সম্বন্ধপদ হিসাবে ষষ্ঠী বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইত। যেমন, 'তুই আমার নাম ও পদ

উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস' ; 'আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন' ; 'আনন্দের অনুভব করিতেছি ;' ইত্যাদি। এখন আমরা এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ-গুলিকে যুক্ত-ক্রিয়াপদের কর্ম্ম হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি ; তখন পর্য্যন্ত 'অপহরণ করিয়াছিস' ইত্যাদি বাক্যাংশ ঠিক যুক্ত-ক্রিয়াপদ রূপে পরিণত হয় নাই, সুতরাং ভাববচনের স্বাতন্ত্র্য ছিল, এবং সেই জন্যই উহার কর্ম্মপদ সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহৃত হইত।

অল্প কতিপয় স্থলে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এখনকার হিসাবে প্রাচীন ( archaic ) বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তখন এইরূপ প্রয়োগ রীতিসিদ্ধ ছিল। যেমন, 'করিলাম না[১] ( =করি নাই ) ; 'যাহাতে না হইতে পায়' ; 'উচিত হয় না' ( =নহে )' ; 'চেষ্টা পাই' ; 'হইতেছে না' ( =হইবে না )' ; 'রহিতেছে ( =থাকিয়া যাইতেছে )'; 'বলেন, বলে' ( =বলিল )।[২]

দ্বিতীয়া-চতুর্থী বিভক্তিতে '-রে' ও '-কে' এই দুই প্রত্যয়ের প্রয়োগই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায়। শেষের দিকের রচনায় '-রে' প্রত্যয়ের অপেক্ষা '-কে' প্রত্যয়ের প্রয়োগই বেশী পাওয়া যায়। 'নিমিত্ত'-বাচক 'জন্য' শব্দের প্রয়োগও শেষের দিকের রচনায় বহুলভাবে দেখা যায়।

বাক্যমধ্যে শব্দ প্রয়োগের রীতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ দেখা যায়। বাক্যমধ্যে মুখ্য উক্তি ( direct speech ) থাকিলে প্রথমে কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ, তাহার পরে মুখ্য উক্তির প্রয়োগ, এবং তাহার পরে ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি ও অবশেষে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন 'শকুন্তলা, আর ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই যাই, অথবা, এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই, এই বলিয়া পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।' 'রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া' ; ইত্যাদি।

১। 'উচিত নয়' এরূপ প্রয়োগও যথেষ্ট আছে।

২। আধুনিকতম সাহিত্যিকেরা সামান্য অতীতের স্থলে বর্ত্তমানের এইরূপ প্রয়োগের অতিশয় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা অবশ্য ইংরেজীর অনুকরণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওজস্বী ও মধুর রচনার সহিত সকলেই পরিচিত, সুতরাং প্রত্যেক রচনার উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শ কু ন্ত লা ও সী তা র ব ন বা সে র মধ্যে এই রচনা উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভ্রা ন্তি-বি লা সে র রচনা বেশ লঘু ও দ্রুতগতি। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির অব্যবহিত পূর্ব্বগ। সাধুভাষার কর্ম্মক্ষমতা ও তৎসহ অক্ষুণ্ণ লঘুত্বের পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকের মুখের ভাষায় কথ্যভাষার ছায়ানুসরণ করিয়াছেন। তথায় দেখা যায় যে প্রায়ই সাধুভাষার ও কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। তখনকার দিনের সাহিত্যিকদিগের লেখার মধ্যে এই শৈথিল্য যথেষ্টই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের তাবৎ উপন্যাসেও এরূপ শৈথিল্য প্রচুর আছে। আরও এক কথা, তখন পর্য্যন্ত কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের রূপের কোন standard বা আদর্শ রূপ দাঁড়ায় নাই, সুতরাং এইরূপ গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ লঘু রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই! তুই যথার্থই পাগল হয়েছ; নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে? ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।[১]

অনেক ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হিন্দী বৈ তা ল-প চ্চী সী গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। ইহা সত্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দী পুস্তক হইতে গল্পের কাঠামো লইয়াছিলেন, ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু ভাষায় তিনি একান্ত নিজস্ব পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১। ভ্রা ন্তি-বি লা স।

হিন্দী বৈ তা ল-প চ্চী সী ও বিদ্যাসাগরের বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি হইতে অনুরূপ অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। দুইটি অংশের তুলনা করিলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

মহারাজ! জহাঁ রঘুনাথজী নে সমুদ্র পর পুল বাঁধা হৈ, উস জা দেখতা ক্যা হুঁ কি সাগর মেঁ সে এক সোনে কা তরবর নিকলা; কি জমুর্‌রুদ কে পাত, পুখরাজ কে ফূল, মূঁগে কে ফলোঁ সে ঐসা খূব লদা হুদা হুআ থা, কি জিস কা বয়ান নহীঁ হো সকতা. ঔর উসপর মহা সুন্দরি স্ত্রী, বীন হাথ মেঁ লিয়ে, মীঠে মীঠে সুরোঁ সে গাতী থী. পর এক ঘড়ী কে বঅদ, বহ পেড় সিন্ধু মেঁ ছিপ গয়া.[১]

'যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধান-বাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবলসাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর লোকাতীতকীর্ত্তিহেতু সেতুসঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল; তদুপরি এক পরমসুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্ব্বক মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল।[২]

ইংরেজী বিরামচিহ্ন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে গিলক্রীষ্টের পুস্তকে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ পুস্তক রোমান হরফে ছাপা হইয়াছিল। বাঙ্গালা হরফে ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকে কমা (comma) প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্নের প্রয়োগ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে না করিলেও সর্ব্বপ্রথমে তিনিই ইহার সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কতদূর শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী

১। বৈ তা ল-প চ্চী সী Duncan Forbes সম্পাদিত ও লণ্ডন হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৭৩।

২। বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি একাদশ উপাখ্যান।

সাহিত্যিকদিগের রচনা আলোচনা না করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কতক পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার প্রকৃত ক্ষমতা কেহই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষাও অধিকাংশ লেখকদিগের আয়ত্তের বাহিরে ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাধীন—অর্থাৎ অনুবাদ নহে এমন রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর, দোষস্পর্শশূন্যপ্রকৃতি সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণমাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান। ১

বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মজীবনচরিত সামান্য কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন

১। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা। দ্বিতীয় পুস্তক। সংবৎ ১৯১২।

চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না ; অনন্তর পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।[১]

বহুবিবাহ সমর্থকদিগের 'চাঁই'দিগকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত ব্র জ-বি লা স এবং র ত্ন-প রী ক্ষা নামক পুস্তিকা দুইখানি বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বই দুইখানির ভাষা আলোচনা করিলে এই অনুমান অযথার্থ বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে র ত্ন-প রী ক্ষা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

তিনি নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রায় সমাপনা হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজবিলাস লিখিয়া কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাস্ লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হইতেছে না। মধুবিলাস দেখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষতঃ স্মৃতিরত্নখুড়ী বুড়ী নহেন ; তাঁহাকে ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবেক, সেটীও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে। যদি বল, আমরা উদ্যোগী হইয়া পুনঃসংস্কার সম্পন্ন করিব ; সে প্রত্যাশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত কারণবশতঃ আর আমার কোনওমতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে না।

---

১। সা হি ত্য। দ্বিতীয় বর্ষ (১২৯৮ সাল), পৃঃ ৩৪৬।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## অক্ষয়কুমার দত্ত—কৃষ্ণমোহন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই অক্ষয়-কুমারের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। সন ১২৪৮ ( = খ্রীষ্টীয় ১৮৪১-৪২ ) সালে ইঁহার প্রথম গদ্য পুস্তক ভূগোল প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে ইংরেজি খবরের কাগজ হইতে কিছু কিছু সংবাদ বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতেন। ১২৪৯ সালে অক্ষয়কুমার বিদ্যা-দর্শন নামে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তাহা বেশি দিন চলে নাই। ১২৫০ সালে অক্ষয়কুমারের সম্পাদকতায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হয়। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইঁহার প্রথম পুস্তক বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগ ১৭৭৩ শকাব্দে (= খ্রীষ্টীয় ১৮৫১ সালে) প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ পরবর্ত্তী বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বইটি **George Coombe** প্রণীত *Constitution of Man* নামক ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। খ্রীষ্টীয় ১৮৫২ হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে দুই ভাগ চারুপাঠ রচিত ও প্রকাশিত হয়। ইঁহার শেষ পুস্তক ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ ১৭৯২ শকে (= খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে ) ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকে (= খ্রীষ্টীয় ১৮৮২ সালে) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি **Wilson** সাহেবের *Religious Sects of the Hindus* নামক প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে রচিত।

অক্ষয়কুমারের কোন রচনাকে ঠিক 'সাহিত্যিক' রচনা বলা যায় না। তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার। তাঁহার রচনা হইতে দেখা যায় যে, সাধুভাষা

পদার্থবিস্থা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি নূতন আমদানি করা পাশ্চাত্য বিষয়ের আলোচনা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য ইঁহার রচনায় তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্য হইয়াছিল। আর প্রধানতঃ এই কারণেই অক্ষয়কুমারের ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতবহুল। আরও একটি কারণ, বিদ্যাসাগর বাক্যমধ্যে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেন তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালা ধাতুর পদ। দত্ত মহাশয় কিন্তু ক্রিয়াপদ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহার প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের বেশীর ভাগই তৎসম শব্দসহিত যুক্ত-ক্রিয়াপদ (compound verb)। ক্রিয়াপদের অপ্রাচুর্য্যের জন্যই অক্ষয়কুমারের ভাষা 'অমসৃণ' ( halting ) বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় অক্ষয়কুমার খুবই ব্যবহার করিয়াছেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপেক্ষাও বেশী। অক্ষয়কুমার খুব বড় বড় সমাসযুক্ত পদ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সমাস করার দরুন স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, 'এই প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এক্ষণে প্রায় তাহা সকলেই স্বীকার করেন।' 'পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে'।

কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, 'তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিময়ী নদীস্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন।' এখনকারদিনে অপ্রচলিত বাক্য-প্রয়োগরীতি ( idiom ) ও যথেষ্ট আছে। যেমন, 'পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে।' 'করিতে হয়' (=করিতে হইবে ); 'ধন্যবাদ করেন'; 'ইহাই যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই।' 'রিপুপরতন্ত্র বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে

কর্ত্তব্য নয় এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে।' 'তখনই তাঁহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাদ্য পবিত্রব্রতে ব্রতী হওয়া হইল।' ইত্যাদি।

বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কর্ত্তা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসাবে অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের লেখার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গম্ভীর অরণ্য মধ্যে অকস্মাৎ যদি এক অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ অনুমান হয় না যে এই অট্টালিকা কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষাদ্বারা এরূপ জানা যায় যে এই অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহাতে মনুষ্যের বসতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে; শয়নালয়, ভোজনালয়, রন্ধনালয় প্রভৃতি যথাক্রমে উপযুক্ত স্থানে অতি পরিপাটী রূপে রচিত হইয়াছে, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় না যে এই ভবন অতি সুখের স্থান, এবং ইহার নির্ম্মাতা অতি নিপুণ? তদ্রূপ এই আশ্চর্য্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার অন্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে এই জগতের এক রচনাকর্ত্তা আছেন? এবং যখন বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই বিশ্ব অনন্ত এবং যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্বাস না হইবে যে জগদীশ্বর জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং স্বভাবে অনন্ত?১

ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্র সুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্ত ব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ

১। ত ত্ত্ব বো ধি নী প ত্রি কা, চতুর্থ সংখ্যা, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭৬৫ শক, পৃঃ ২৫। প্রবন্ধটির শেষে অ, কু, দ, এই স্বাক্ষর আছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে 'তাহারদের' এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে।

করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ-সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না; অতএব চিত্ত মধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।[১]

অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় প্রকাশিত পুস্তক চা রু পা ঠ (প্রথম ভাগ) হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

একাল পর্য্যন্ত জনসমাজে যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে সর্ব্বদেশীয় লোক-দিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতরবিশেষই এরূপ শ্রেণীভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণীভেদ হইতে, সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় গদ্যভঙ্গির জন্য যদি কাহারো নিকট অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ঋণী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি রেভারেণ্ড কে, এম্, ব্যানার্জ্জি নামেই অধিক খ্যাত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা সু দে ব-চ রি ত কোন সালে লিখিত হইয়াছিল তাহা জানা নাই। ইঁহার বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহনের বি দ্যা ক ল্প-দ্রু মে র প্রথম কাণ্ড বাহির হয়।

বে তা ল-প ঞ্চ বিং শ তি র পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যে যত কিছু পুস্তক বাহির হইয়াছিল, বি দ্যা ক ল্প দ্রু মে র ভাষা সে সকলের অপেক্ষা সরল, উন্নত ও মধুর। কৃষ্ণমোহনের লেখায় পূর্ণচ্ছেদের স্থানে কমা (comma) চিহ্নের প্রয়োগ লক্ষণীয়। বি দ্যা ক ল্প দ্রু মে র তৃতীয় কাণ্ড[২] হইতে নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দুর্য্যোধনের দলস্থ একজন বীরের নাম অশ্বত্থামা, ইনি পাণ্ডবদের গুরু পুত্র, দুর্য্যোধন যুদ্ধে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলে ও তাহার দল পরাস্ত প্রায় হইলে তাহার সন্তোষের নিমিত্তে অশ্বত্থামা

১। ভূ গো ল, ভূমিকা।

২। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২১।

গোপনে পাণ্ডবদের শিবিরে রাত্রিযোগে গমন করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু পুত্রকে নিদ্রাবস্থাতে দেখিয়া তাহাদের শিরচ্ছেদন করেন, তাহাতে দ্রৌপদী নিজ পুত্রের বিনাশ দেখিয়া ঘোরতর শোকে ব্যাকুল হওত, পূর্ণনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সেই ক্রন্দনের শব্দে অর্জ্জুন শিশুহত্যার সংবাদ পাইয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করত তাহার সান্ত্বনার্থে জ্বলন্ত ক্রোধে কহিলেন "হে প্রিয়ে আমি অদ্যই ঐ নরাধম শিশুহন্তার মস্তক ছেদ করিয়া তোমার পদতলস্থ করিব", এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, অশ্বত্থামা তাহাকে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বেগে আসিতে দেখিয়া রথারূঢ় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, অবশেষে আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া অর্জ্জুনের সংহারার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন তিনি ঐ সংহারক অস্ত্র প্রকৃত রূপে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করণে নিপুণ ছিলেন না, তথাপি প্রাণভয়ে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সে বজ্রস্বরূপ অস্ত্রে অর্জ্জুনের কোন হানি না হওয়াতে অশ্বত্থামা শীঘ্র শত্রুহস্তে পড়িলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সকলে হয়ত জানেন না যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শুধু একজন বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন না, বাঙ্গালা ভাষার একজন বড় লেখকও ছিলেন। ইঁহার ভাষা অবশ্য সংস্কৃতঘেঁষা ছিল। ইনি সরল বাক্য প্রয়োগ অপেক্ষা জটিল ও যুক্ত বাক্য (complex and compound sentence)-এর অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যও অত্যধিক ছিল। ইঁহার ভাষার সৌন্দর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা হইতে হীন হইলেও, ইহার মধ্যে জোর ছিল, এবং তিনি যে যে বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন—প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক—সেই সেই বিষয়ের পক্ষে তাঁহার ভাষা যে যথেষ্ট উপযোগী ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিত্র মহাশয় ইংরেজী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি ইঁহার রচনায় ইংরেজী বাক্য-রীতির ছাপ একেবারেই নাই বলা চলে। বরঞ্চ সংস্কৃত বাক্য-রীতির ছাপ মোটেই দুর্ল্লভ নহে। যেমন, 'উক্ত গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়'—(এখানে 'হয়' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংস্কৃত 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের অনুবাদ মাত্র); 'কাশ্মীর জাতীয় লোকেরা আর এক বস্তু সমাহরণে আশ্চর্য্য প্রকারে প্রবর্ত্তমান হয়।'

বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ছাড়াও রাজেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ 'সাহিত্যিক' রচনায়ও যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রথম বর্ষের বি বি ধা র্থ সং গ্র হ হইতে একটি ছোট 'কৌতুককণা'[1] উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বিশেষণ শব্দের বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ ভাল

অনেক একচক্ষুহীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি ঐ নয়ন দ্বারা অনেক দ্বিনেত্র ব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্রবলগর্ব্বিত এতদ্বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন: "যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত মুদ্রা দিব"। অন্ধ ঐ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক; "আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ।" দ্বিনেত্রবলগর্ব্বিত ব্যঙ্গ করত কহিল: "তোমার এক চক্ষু"। অন্ধ কহিলেক; "ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দাও"।[2]

প্রথম যুগের রচনায় যেরূপ বিভিন্ন ধরণের বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা একত্রে গ্রথিত হইত, রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। যেমন, 'ইতিহাস বিষয়ে এতদ্দেশে যে প্রকার অনাদর, পুরাবৃত্ত বিষয়েও তদ্রূপ; ও কেহ কোন প্রাচীন স্থানের কিংবা ব্যক্তির আখ্যান অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে উপহাসও করে।' উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে ইংরেজী জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্নের ব্যবহার তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টে লি মে ক স তন্নামক ফরাসী কাব্যের প্রথম ছয় সর্গের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে নিখুঁত বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত

১। বি বি ধা র্থ-সং গ্র হে র প্রত্যেক সংখ্যায় রাজেন্দ্রলাল 'কৌতুককণা' এই শীর্ষকে ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে হাস্যরসাত্মক ছোট ছোট 'কথিকা' প্রকাশ করিতেন। 'কৌতুককণা' নামটি বেশ উপযোগী। গল্পটি প্রথম বর্ষ (১৭৭৩ শক)-এর বি বি ধা র্থ-সং গ্র হ, কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

২। বি বি ধা র্থ সং গ্র হ, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ৫১।

একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার প্রথম তিন সর্গ সন ১২৬৫ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৫৮) সালে রচিত। এই পুস্তকের রচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও হাত কিছু ছিল। গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

রচনার নমুনা হিসাবে টে লি মে ক স হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[১]

টেলিমেকস কহিলেন, মিশর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহুবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনিশিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ বহুবিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। সহসা কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। [ দ্বিতীয় সর্গ। ]

এই-জাতীয় রচনার মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের কা দ ম্ব রী একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তৎসম শব্দের ঘনঘটা ও সমাস-বাহুল্যের মধ্য দিয়া তারাশঙ্কর মূল কাদম্বরীর শব্দঝঙ্কার ও শব্দচিত্র যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তারাশঙ্করের অন্যতম আখ্যায়িকা রা সে লা স। ইহা জনসন সাহেব রচিত তন্নামক উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হইয়া ১৯১৬ সংবতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনা সংস্কৃত-ঘেঁষা, অন্যথা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। তারাশঙ্কর এই বইটি মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ করেন নাই। খ্রীষ্টীয়

১ খ্রীষ্টীয় ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ষোড়শ সংস্করণ অবলম্বনে। চতুর্দ্দশ ( কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল ) ও পঞ্চদশ সংস্করণে ( চৈত্র ১৩১৪ সাল ) গ্রন্থকার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়াছিলেন। "পাঠকগণের অনায়াসে অর্থবোধের নিমিত্ত অনেক সমস্তপদ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি স্থল বালকগণের পাঠের অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।" [ পঞ্চদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ]।

১৮৩৩ সালে মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রা সে লা সে র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইটি অবলম্বন করিয়াই তারাশঙ্কর রা সে লা স রচনা করেন।

রামগতি ন্যায়রত্নের রো মা ব তী সংবৎ ১৯১৮ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৬১) সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত; ভাষা যথেষ্ট সংস্কৃত-ঘেঁষা। বইটি অনুবাদ কি মূলগ্রন্থ তাহা গ্রন্থকার বলেন নাই। আখ্যায়িকাভাগ যাহাই হউক রচনার অধিকাংশই যে সংস্কৃতের অনুবাদ অথবা সংস্কৃতের ছায়াবলম্বনে রচিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থকার দ শ কু মা র-চ রি ত, কা দ ম্ব রী প্রভৃতি সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের আদর্শে ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় অব্যবহৃতপূর্ব্ব ও অপরিচিত অনেক তৎসম শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ ইহাতে আছে। যেমন, 'বর্ণিল জল'; 'অশোক শাখী'; 'উদার-গুণ-পিশুন বদনমণ্ডল'; 'সর্ব্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া'; 'ইভ-দলিত সর্জ্জতরু'; 'কৌবেরী দিক্'; 'শিফা-সংঘাত'; ইত্যাদি। 'প্রতিবাসি-গণেরা' প্রভৃতি প্রাচীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগও নিতান্ত বিরল নহে।

এ সকল দোষ সত্ত্বেও রো মা ব তী-র ভাষা নিন্দনীয় নহে। ভাষার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আছে। রচনার নমুনা হিসাবে নীচে কিছু তুলিয়া দিতেছি।

যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়, তিনি অত্রত্য কোন বিভবশালী জনের দুহিতা হইবেন। এস্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ পরিণত বিম্বফলে বায়সের চঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় কি একান্ত উপহাসাস্পদ হইবে না? বন্ধো! তুমি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ "অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশকারিণী ও হৃদয়শোষিণী" এই সামান্য নীতিসূত্র তোমার নিকট আর কি আম্রেড়িত করিব? আহা! আন্বীক্ষিকী বিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিগের কটাক্ষ মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অসার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র খণ্ড করিলেও রাগ যায় না।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## প্যারীচাঁদ মিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ

'টেকচাঁদ ঠাকুর' (প্যারীচাঁদ মিত্র)-প্রণীত আ লা লে র ঘ রে র দু লা ল সন ১২৬৪ (খ্রীষ্টীয় ১৮৫৭) সালে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা প্রায় সবই সংস্কৃত (অথবা ইংরেজীর) অনুবাদ বা ছায়া রচনা। সুতরাং আ লা লে র ঘ রে র দু লা লের কথ্যভাষা-মূলক ভাষা ও জনসাধারণের পরিচিত বিষয়-বস্তু সকলকেই কম বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। এ অনেকটা 'পিণ্ড-খর্জ্জুর খাইয়া বিরক্ত হইয়া তিন্তিড়ী ভক্ষণের' মত। (আমি অবশ্য আ লা লে র ঘ রে র দু লা ল-কে সর্ব্বাংশে তিন্তিড়ী-শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহি না।) বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মূল কারণই এই বলিয়া আমার মনে হয়। নতুবা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে আ লা লে র মধ্যে ভাষা ও রচনারীতির দোষ অনেক কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ আ লা ল-কে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না; ইহা একটি গল্পসূত্রে রচিত কতকগুলি চিত্রসমষ্টি মাত্র। আর ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃই নীতিমূলক। ভাষার দিক হইতে—এবং অনেকটা ভাবের দিক হইতেও—বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে কেরির ক থো প ক থ ন, প্রমথনাথ শর্ম্মার ন ব বা বু-বি লা স, টেকচাঁদ ঠাকুরের আ লা লে র ঘ রে র দু লা ল, এবং কালীপ্রসন্নের হু তো ম পেঁ চা র ন ক্সা একই পর্য্যায়ের গ্রন্থ।

আ লা লে র ভাষার প্রধান গুণ, ইহা সকলের বোধগম্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গ্রন্থকার এই উপায়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন—যুক্ত ক্রিয়াপদের (compound verb) বর্জ্জন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কথ্য-ভাষার ধাতুর ব্যবহার; তদ্ভব ও দেশী প্রচলিত শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ; তৎসম শব্দের

ন্যূনতম প্রয়োগ ; সমাস-যুক্ত পদের পরিবর্জ্জন ; এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার। ইংরেজী শব্দও কতকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, 'ডবল', 'বোট', 'বাক্স', ইত্যাদি। পূর্ণচ্ছেদ অথবা কমা (comma) ও সেমিকোলন (semicolon)-এর পরিবর্ত্তে ড্যাশ (dash) বা কষির ব্যবহার খুবই করা হইয়াছে। পূর্ণচ্ছেদ অনেক সময় বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আ লা লে র ভাষার প্রধান দোষ ইহাতে একই বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া-পদের সাধুভাষা ও কথ্যভাষার রূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন[১]—"মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরু মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই জানেন না।" "ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি—ভেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত ;" "চোক টিপ্তে লাগিলেন ;" "ধেয়ে আইল ;" ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের কথ্যভাষার রূপ প্রায়ই প্রকৃত নহে, সাধু ভাষা হইতে গঠিত বিকৃত রূপ। যেমন, 'চট্‌কাতেছেন,' 'ভাবতেছেন,' 'উঠতেছে,' ইত্যাদি (এইগুলি অবশ্য ভাগীরথী-তীর হইতে কোন পৃথক্ অঞ্চলের উপভাষা হইতে পারে) ; 'শুনিয়ে,' ইত্যাদি। কথ্য-ভাষা হইতে গঠিত বিকৃত সাধুভাষার ক্রিয়াপদও কতকগুলি পাওয়া যায়। যেমন, "পালিয়া (=পালাইয়া) আসিতে হইয়াছিল ;" "পেছিয়া" (=পিছাইয়া) ; "সকলেই ঘাড় বাড়িয়া (=বাড়াইয়া) কান পেতে রহিলেন ;" ইত্যাদি

আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্যও একটা দোষ বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন বইটি রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনে এই সকল আরবী ফারসী শব্দ জনসাধারণের খুবই সুপরিচিত ছিল তাহাতে সন্দেহ

১। খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে সুচারু যন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা হইয়াছে।

নাই। "সেখানে তাহাদিগকে বাজিঙ্গির মাটি কাটিতে হয়" ইত্যাদি প্রয়োগ এখন দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক সময় তৎসম ও বিদেশী শব্দ বিকৃতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কতক ক্ষেত্রে ইহা ছাপার ভুল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে। যেমন, 'সবি' (=ছবি); "আমাদিগের কেবল বাঁশবোনে রোদন করা"; ইত্যাদি।

পূর্ব্বতন ভাষার ছাপও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন, '-দগে' (=দিকে); 'করত' (=করিয়া), 'হওত' (=হইয়া); 'হওন'; 'উত্তরিলেন' (=পৌঁছিলেন); "গুণ (=গুণবান্) পুরুষেরা"; ইত্যাদি।

'বল্' ও 'কহ্' উভয় ধাতুরই প্রয়োগ আছে, তবে 'বল্' ধাতুর প্রয়োগই খুব বেশী। 'আপনকার', হইবেক' ইত্যাদিরও অল্পস্বল্প প্রয়োগ আছে।

সামান্য বর্ত্তমান ও অসম্পন্ন বর্ত্তমান যথাক্রমে অসম্পন্ন বর্ত্তমান ও অতীতের স্থলে প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "তাঁহার নিকট দুই একজন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে—"; "বাবুরাম চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দুই দিগ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন।"

আ লা লে র ভাষার মধ্যে বিশুদ্ধ ও মিশ্র সাধুভাষা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর উপভাষার নমুনা পাওয়া যায়। উপভাষাগুলি কথ্যভাষা-মূলক বটে, কিন্তু কিছু কিছু ভেজালও আছে। তাহা অবশ্য অপরিহার্য্য। উপভাষার রচনাগুলি থাকার দরুণ বইটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। এই বিভিন্ন ধরণের রচনার কিছু কিছু উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

[ বিশুদ্ধ সাধুভাষা : ]

শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তির ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা করা কর্ত্তব্য হয় না। যেমন

শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বুদ্ধি হয়। মনের সদ্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক। একটি সদ্ভাবের চালনা করিলেই সকল সদ্ভাবের চালনা হয় না।

[ মিশ্র সাধুভাষা : ]

ছেলে একবার বিগড়ে উঠ্‌লে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে ২ পেকে উঠ্‌তে পারে তখন কুকর্ম্মে মন না গিয়া সৎকর্ম্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা। অতএব যে পর্য্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক।

[ ভদ্রলোকের কথ্যভাষা ( ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের ) : ]

বাবুরাম বাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বল্‌ব?—এ আমাদিগের জেতের দোষ। বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপর ঘড়া দেবে তো? মুক্তর মালা দেবে তো? আরে আবাগের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—মেয়ে ভাল কি মন্দ অন্বেষণ কর?

[ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের কথ্য ভাষা : ]

( ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে ) মোদের নসিব বড় বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় ডর তেনা বি পেণ্টে সাদি করে। ( বাহুল্য বলিল—) দোস্ত! এ সব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি,—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহানম্মে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।

অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। বইটির অধিকাংশই মিশ্র সাধুভাষায় রচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্রিয়াপদের সাধু ও কথ্যরূপ প্রায় এক সঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য ব্যাকরণ ও রচনারীতির হিসাবে দোষ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এই প্রয়োগের জন্য এবং আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের জন্য রচনা বিশেষ সরস ও রোচক হইয়াছে।

টেকচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থও সাধুভাষায় রচিত, তবে চলিত-ভাষার মিশ্রণ

কম বেশী আছেই। বন্ধনীস্থিত (parenthetic) বাক্যের প্রয়োগও খুব আছে। ভাষার এই সকল দোষ সত্ত্বেও টেকচাঁদ রসসৃষ্টিতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। নিম্নে শিকারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে টেকচাঁদের ভাষার গুণ ও শক্তি বুঝা যাইবে।

গজোপরি দুই জন নব্য মিলেটরি ও একজন প্রাচীন পাদ্‌রী বসিয়াছেন। দুইজন মিলেটারি শার্দ্দূল ও বরাহ শীকার জন্য দুরবীক্ষণ দ্বারা দূরদৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বর্শা, বদনে চুরুট—তাহার ধূমেতে ক্ষুদ্র মেঘোৎপত্তি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ। প্রাচীন পাদ্‌রী আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, যজন-যাজন ও অধ্যাপনে নিপুণ এক এক বার ভয়েতে ঈষৎ কম্পমান ও ভাবিতেছেন, ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমিসাৎ হই, শীকার কখন দেখি নাই, এ জন্য আসিয়াছি—দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট গল্প করিব ও ইহার বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, কিন্তু বুঝি অপঘাত মৃত্যু উপস্থিত। দুই জন মিলেটরি পাদ্‌রীর রকম সকম দেখিয়া চথ-টেপাটেপি করিতেছেন, পাদ্‌রী তাহা বুঝিয়া বীরবদন ধারণার্থে নিমগ্ন। সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ মুহ্যমান, তাহাদিগের জন্ম ও লয়ের ব্যবধান ব্যবধানমাত্র ও যাহা প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ-হিল্লোলেই প্রকাশ। এ জন্য সকলের সকল ভাব সকলে অনবগত। হস্তী মন্দমন্দ গতিতে চলিয়াছে, শুণ্ড অর্দ্ধ-উত্থিত—সাময়িক নিনাদ বন-শান্তি-বিঘ্নকর। ইত্যবসরে দূর হইতে আলম্‌—আলম্‌ শব্দ উঠিল, "ঐ এলো রে ঐ এলো রে" তাহার পর কর্ণগোচর হইল। অমনি কতকগুলি বন্য লোক টিকারা ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল—"দাদা বাঘ মার্‌তে চল দাদা বনচাল্‌তের ফল।" বন্যদিগের হস্তী নাই, অশ্ব নাই, বন্দুক নাই, চর্চ্চা নাই, কেবল খড়্‌গ ও তীর লইয়া অকুতোভয়ে শার্দ্দূলের প্রতি ধাবমান হইল। দেখিবামাত্রেই ব্যাঘ্র লাঙ্গুল ল্যাগ-ব্যাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বন্য লোকদিগের উপর লম্ফ দেয়, এমন সময়ে তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ তীর মারিয়া ব্যাঘ্রকে ভেদ করিয়া খড়্‌গ দিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল; সাহেবেরা বন্য লোকদিগের পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও শীকারার্থ গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। [ অভেদী ]।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সাহিত্যসৃষ্টি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে আরম্ভ হইলেও তাঁহার প্রধান রচনাগুলি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যের দিক দিয়া সিংহ মহাশয়ের নাটকগুলি মূল্যহীন না হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি-

মহাভারতের অনুবাদ[১] ও হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্ শা। মহাভারতের অনুবাদে কালীপ্রসন্নের রচনা কতটুকু আছে তাহা বলা দুষ্কর, ইহা অনেক পণ্ডিতের রচনা। আদি পর্ব্বটুকু প্রায় সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছিলেন। তবে বিভিন্ন অনুবাদকের রচনার সামঞ্জস্য সম্পাদন বোধ হয় কালীপ্রসন্নেরই কীর্ত্তি, আর এই কীর্ত্তি নেহাত তুচ্ছ নয়।

শকাব্দ ১৭৮২ ( =খ্রীষ্টীয় ১৮৬০ ) সালে বৈশাখ মাস হইতে কালীপ্রসন্ন বি বি ধা র্থ সং গ্র হে র নবপর্য্যায় বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তিনি যে সম্পাদকীয় ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে সাধুভাষার রচনায় সিংহ মহাশয় কতদূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎপত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে—জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্যনির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয় সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি; [ ইত্যাদি ]।

হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্ শা কেবল কালীসিংহের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য-রসিকদিগের আদরের বস্তু। হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্ শা

১। মহাভারতের অনুবাদ খ্রীষ্টীয় ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত হয়।

ইংরেজী ১৮৬২, শকাব্দ ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।[১] হু তো ম প্রকাশিত হইতেই সাহিত্য-সমাজে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, কতক দল ইহার বিরুদ্ধ হইল, এবং কতক দল—যাহারা সংখ্যায় অল্প—তাহারা ইহার পক্ষপাতী হইল। বিরুদ্ধ দলের বিরূপতার দুইটি কারণ ছিল—(১) ভাষার অভিনবতা, বা তাহাদের মতে নীচতা, এবং (২) ভাবের অশ্লীলতা। আর যাঁহারা ইহার পক্ষপাতী হইলেন তাঁহাদেরও দুই যুক্তি ছিল—(১) ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা এবং (২) সামাজিক দুর্নীতি প্রদর্শন। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি দুইটির তত্বন্ধে আমরা কিছু বিচার করিব। তাহার পূর্ব্বে হু তো মে র ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

হু তো ম প্যাঁ চা র ন কৃশা পড়িতে গেলে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৌখিক ক্রিয়াপদের অজস্রতা এবং ঐ ক্রিয়াপদের (ও কতক কতক তদ্ভব শব্দের) অদ্ভুতদর্শন উচ্চারণ-ঘেঁষা বানান। আ লা লে র ঘ রে র দু লা লে মৌখিক ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য্য ছিল বটে, তবে বানান এতটা পরিমাণে উচ্চারণ-ঘেঁষা ছিল না। আর মৌখিক ক্রিয়াপদের সহিত লৈখিক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হওয়াতে গুরুচণ্ডালী দোষের আধিক্য ছিল। হু তো মে এই দোষ নাই বলিলেই হয়।

'করিতে' এই ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপ 'কর্ত্তে' ও 'কত্তে' দুই-ই ব্যবহার করা হইয়াছে। পদের আদি অক্ষরে একার উচ্চারণ থাকিলে তাহা য-ফলা দিয়া লেখা হইয়াছে, যেমন, 'দ্যেখে (=দেখিয়া), 'ব্যোধে,' 'প্যোকে,' 'ফ্যেলে,' 'খ্যেলেন,' 'ঢ্যেলে,' 'ভ্যেজে,' 'হাঁটু গ্যেড়ে,' 'ছ্যেলে,' 'ভ্যেড়ে,'

১। প্রথম সংস্করণে দুইটি টাইটেল পত্র ছিল, প্রথমটি ইংরেজী ও দ্বিতীয়টি বাঙ্গালা। Sketches by Hootum। illustrative of। Every Day life and Every Day। People। Vol I; হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ।

'চীফ', 'স্নেক হ্যাণ্ডস্', ইত্যাদি। কচিৎ পদমধ্যস্থিত এ-কারের উচ্চারণ দেখাইতে য-ফলা ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'পাড়াগোঁয়ে'। মহাপ্রাণ বর্ণ প্রায়ই অল্পপ্রাণ করা হইয়াছে—অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মৌখিক উচ্চারণ অনুযায়ী প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে রূপান্তরিত ভাবে লিখিত হইয়াছে; যেমন, 'মাতা' (=মাথা), 'মাট' (=মাঠ), 'মিচে' (=মিছে), 'কাচে' (=কাছে), 'লাপিয়ে', (=লাফিয়ে). 'পাকি', (=পাখী), 'বাগ' (=বাঘ), 'বাঁদা' (=বাঁধা), ইত্যাদি। তৎসম শব্দেও কচিৎ এইরূপ হইয়াছে; যেমন, 'রতে' (=রথে) ইত্যাদি। এ-কারের বিবৃত উচ্চারণ 'অ্যা' এইরূপে দেখান হইয়াছে। উচ্চারণের অনুকৃতিতে 'নাচ্‌তে' নাচ্‌তে' 'নাস্তে নাস্তে' এইরকম লেখা হইয়াছে। অ-কারান্ত শব্দের ও-কারান্ত উচ্চারণ হইলে তাহা ও-কার দিয়াই লেখা হইয়াছে; যেমন 'ঈশ্বর গুপ্তো।'

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের বিশেষ উপভাষার ছাপও হু তো মে র মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

'কবার' (=কইবার), 'নেছেন' (=নিয়েছেন), 'বলেছেল' (=বলেছিল), 'পাধ্‌ধুলো' (পার ধুলো=পায়ের ধুলো), 'আলো নিবুয়ে' (=নিবিয়ে), 'সিটি' (=সে-টি), 'ইটি' (=এ-টি), 'স্থে গ্যাল' (=দিয়ে গেল), 'নাপাতে নাপাতে' (=লাফাতে লাফাতে), 'নড়াই' (=লড়াই), 'বাঁসা' (=বাসা), 'হাঁসবেন', 'পৌত্তুরী' (=পৌত্রী), 'ভটচাজ্জিরে' (=ভট্টাচাজ্জিরা), 'বাবুয়ো' (=বাবুরা), 'কারুই,' 'কারুরই' (=কাহারই), 'ডেড়মন' (=দেড় মন), 'পাইনে' (=পাই না), 'বাই কল্লেন' (=বাহির করলেন), ইত্যাদি। 'দাঁড়ালেম', 'জ্বল্‌তেছিল' ইত্যাদি পদও আছে আবার 'পড়্‌তুম' ইত্যাদি প্রকৃত কথ্য-ভাষার পদেরও অসদ্ভাব নাই।

'-রে' প্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয়া-চতুর্থীর পদের প্রয়োগ এক কালে কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষার বিশেষত্ব ছিল। হু তো মে ইহার প্রয়োগ খুবই আছে '-কে' প্রত্যয়ও সমান ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বহুবচনে '-এরা' প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে '-রা' প্রত্যয়ও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 'মাতাল্‌রা,' 'উড়ে বামুন্‌রা' ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে এই '-রা' প্রত্যয় সাহিত্যের ভাষায় খুব জোর ভাবে চলিতেছে।

বাক্যের মধ্যে বন্ধনীস্থিত ( parenthetical ) বাক্যের প্রয়োগ হু তো মে র ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব। নিম্ন উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটিতে অতীত কালের স্থলে বর্ত্তমানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইহা তৎকালে প্রচলিত রীতি ছিল। 'সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়'; 'কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই সুদ্ধু পায়ে আসা হয়।'

তখনকার দিনে ভদ্র সমাজে যে সকল ফারসী ও ইংরেজী কথা চলিত ছিল কালীপ্রসন্ন তাহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আ লা লে র ঘ রে র দু লা লে যত আরবী ফারসী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে হু তো মে তত নাই। ইহার কারণ, হু তো মে আদালত সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই, এবং ইতিমধ্যে কথ্যভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার কিছু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল।

হু তো মে র ভাষার অন্যতম প্রধান গুণ হইতেছে সরসতা (humour)। সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম না হইলেও ইহা যে খাঁটি তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রাম্যতাদোষ-বর্জ্জিত সরসতা ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। নাটকাদিতে যাহা দেখা যাইত তাহা ভাঁড়ামির অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। এখন সরসতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভূত পেত্‌নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো।[১]

---

১। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮৩।

প্রলয় গর্দ্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক মুহুরী বল্লে—।১

নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড়হস্ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমে রইল না।২

নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রাম্‌গোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উড়েন্ প্যান্‌সীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তন্নো সেরে যান, ছেলেটী কেবল ট্রুকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।৩

রসরাজ সম্পাদক চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুক্‌লেন।৪

আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যামবিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে একখানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুন্‌লেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো৫।

ইংরাজী পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটীও তাঁর জানা ছিলো, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলীও "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলে পড়্‌তে হয়।৬

হুতোমী ভাষায় যে গম্ভীর রচনা অসম্ভব নয় তাহা হু তো ম হইতে উদ্ধৃত এই অংশটি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না! সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ একশো বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে?৭

প্রধানতঃ ব্যঙ্গ ও রস-রচনা হইলেও এবং হালকা ভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও হু তো ম প্যাঁ চা র নক্‌ শা র মধ্যে মৌলিক উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ ইহার ভাষাকে মধ্যে মধ্যে গম্ভীর রচনার শান্তশ্রী প্রদান করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব মিশ্রিত থাকায় ইহা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি।

১। পৃঃ ৯৫। ২। পৃঃ ১০৩। ৩। পৃঃ ১১৩। ৪। পৃঃ ১১৮। ৫। পৃঃ ১২৪। ৬। পৃঃ ১৫৫। ৭। পৃঃ ১৪৫।

ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন, বর্ত্তমান স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীরভাবে এসে পড়লেন, আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্‌ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্‌গুর্‌ করে; মড়ুঞ্চে পোয়াতির বুড় বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্‌ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়্‌লেন।[১]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হু তো মে র ভাষাতে বন্ধনীস্থিত (parenthetical) বাক্যের ব্যবহার খুবই বেশী দেখা যায়। এখানে তাহার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দিতেছি।

কোথাও 'অসৈরণ সৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি' সং—অসৈরণ সইতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেনটুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট চাপকান পরা (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে থানায় পড়ে ছুচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফারমেসনের স্পিচ্‌ করেন দেখে সিকেয় ঝুলচেন![২]

বঙ্কিমচন্দ্র হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্‌ শা র উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। অথচ আ লা লে র ঘ রে র দু লা লে র ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আ লা লে র ঘ রে র দু লা ল মৌখিক ভাষায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বাঙ্গালা উপন্যাসের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা ভুলিলেও চলিবে না। এ সকল সত্ত্বেও আমরা বলিব যে আ লা লে র ভাষায় বহু দোষ আছে, এবং ভাষা হিসাবে ও রসরচনা হিসাবে হু তো ম, আ লা ল হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। দুইটি কারণে বঙ্কিমচন্দ্র হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্‌ শা-কে পছন্দ করিতেন না, প্রথম কারণ ইহার অশ্লীলতা (?) দোষ, দ্বিতীয় কারণ গ্রন্থকারের মক্ষিকাবৃত্তি ও গুণগ্রাহিতার অভাব।

হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্‌ শা র মধ্যে যে চারিটি প্রস্তাব আছে তাহার মধ্যে 'মাহেশের রথযাত্রা' ছাড়া আর কোন প্রস্তাবে রুচিবিরুদ্ধ কিছু আছে কিনা সন্দেহ। অপর প্রস্তাব গুলির মধ্যেও দুটি একটি আধুনিক কালে অব্যবহৃত বা অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া এমন কিছুই নাই যাহা রুচিবিরুদ্ধ (indelicate)

১। পৃঃ ৫৫। ২। পৃঃ ২০।

বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। যাহাকে অশ্লীলতা বলে এমন কিছু হু তো মে র মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবুর সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিবাগীশতার আধিক্য আসিয়া গিয়াছিল, আর এই রুচিবাগীশতা বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জী ব ন স্মৃ তি তে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অত্যধিক রুচিবাগীশতার দরুনই বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর স ধ বা র এ কা দ শী র প্রশংসা করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র হু তো ম কে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক ল্প ত রু র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ক ল্প ত রু হু তো ম অপেক্ষা অনেক পরিমাণে রুচিবিরুদ্ধ।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## ভূদেব—মধুসূদন

ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস কোন সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহা যে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রচিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পুস্তকখানি Romance of History নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত হইলেও ইহার ভাষা অধিক মাত্রায় সংস্কৃতঘেঁষা। নিম্নে উদাহরণ দিতেছি।

যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণ-ধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষদৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরম সুখের প্রধান বস্তু করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক সেই বস্তু দ্বারাই কি রকম বিপাকে পতিত হইতেছে![1]

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস সন ১২৮২ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫) সালের ৬ই কার্ত্তিক হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে এডুকেশন গেজেটে বাহির হইতে থাকে। এই বইটির ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা হইলেও বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও অভিনব। ইহার যতদূর আদর হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই; ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যগগনে দেদীপ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন তৎকালে উত্তরদিকস্থ পটমণ্ডপ হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ একজন কৃশাঙ্গ যুবাপুরুষ সুগভীর চিন্তাবনতমুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রম পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চভাগে উপস্থিত হইলে, দুইজনেই একেবারে সিংহাসনের উপর পরস্পর সম্মুখীন![2]

১। ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৪—১৫। ২। ১৩০২ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৮।

ঐ তি হা সি ক উ প ন্যা স রচনার বিশ বৎসর পরে পু ষ্পা ঞ্জ লি নামক প্রবন্ধসমষ্টি রচিত হয়। ইহার ভাষাও সংস্কৃতঘেঁষা, তবে ঐ তি-হা সি ক উ প ন্যা সে র মত নহে। পরবর্ত্তী কালে ভূদেব যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন তাহার ভাষা বেশ সরল ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী। আ চা র-প্র ব ন্ধ হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্র সমূহের বিলোপ হইয়া গেলে কোন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! কিন্তু সেরূপ মনে করা একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদ্গম। শ্রুতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াগুলিও বেদোক্ত ক্রিয়া হইতে উদ্গত।[১]

সরল সাধুভাষায় রচনাতেও ভূদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার ডায়েরীর ভাষা অনবদ্য।

হে ক্ট র ব ধ মধুসূদনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা। ইহা ইংরেজী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল ১৮৬৭-৬৮ সাল।[২] হোমরের ই লি য়া ড কাব্যের মূল গ্রীকের অনুসরণে ইহা রচিত হইয়াছিল। হে ক্ট র ব ধ শুধু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইচ্ছাসত্ত্বেও কবি অবশিষ্ট অংশটুকু রচনা করিতে পারিয়া উঠেন নাই।

শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুর্গতিতে মহাকবি তখন জর্জ্জরিত। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি পরিস্ফুট নাই, আর তাহা আশাও করা যাইতে পারে না। তৎসত্ত্বেও বইখানি অপূর্ব্ব। প্রকাশকালে ইহা অবজ্ঞাত ও অনাদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকেরা অনেকে ইহার নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের রসজ্ঞ বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, অন্ততঃ প্রকৃত

---

১। তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৯। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৮৯৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি বহুপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

২। উৎসর্গ-পত্র দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যের সমাদর দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কিন্তু মধুসূদনের এই অপূর্ব্ব গদ্যগ্রন্থের সমাদর না করিয়া সাধারণ শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজ যথার্থ রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। না পারার অবশ্য কিছু কারণও আছে। প্রথমতঃ, হে ক্ট র ব ধে র ভাষার স্বাতন্ত্র্য সমসাময়িক রচনা হইতে এত পৃথক্ যে আপাত-দৃষ্টিতে উৎকট বলিয়া বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, তখন উপন্যাস-সাহিত্যের সবে সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্কিম-চন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলি সকলকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সে সময়ের রুচিতে গ্রীক উপাখ্যান ভাল লাগিবে কেন? তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররস নাই (এক মে ঘ না দ-ব ধ ছাড়া), বাঙ্গালী বীররসের বিশেষ সমঝদারও নহেন। সুতরাং প্রকৃত বীররসাত্মক গদ্যকাব্য আদি ও করুণরসে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ ভাল লাগিবার কথা নহে।

হে ক্ট র ব ধে র ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। এক মধুসূদনই এই ভাষা লিখিতে সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহ সে যোগ্যতা ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই। পারিলে বাঙ্গালা ভাষা পরম শক্তি লাভ করিতে পারিত। মধুসূদনের যে দূরদৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন সাহিত্যিকের ছিল না বা নাই।

হে ক্ট র ব ধে র ভাষায় নামধাতুর বাহুল্য আছে, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য আছে, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী সমাসযুক্ত পদ আছে। তবে পণ্ডিতী বাঙ্গালার মত বহুশব্দবিশিষ্ট লম্বা, কিম্ভূতকিমাকার সমাস একেবারেই নাই। কাব্যের ধাঁচে বাক্যরচনাও যথেষ্ট আছে। এই সকল যাহা অল্পশক্তিশালী লেখকের হস্তে দোষ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা মধুসূদনের হাতে ওজঃগুণবিশিষ্ট হইয়া পরম উপভোগ্য হইয়া দাঁড়াইল। হে ক্ট র ব ধে র প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে মূল ই লি য়া ডে র সুর-ঝঙ্কার দুর্ল্লভ নহে, এবং গ্রীক মহাকাব্যের উদার অবকাশ ও বিরাটত্বের আভাস ইহার মধ্যে খানিকটা পাওয়া যায়। কোন

প্রাদেশিক আধুনিক ভাষার শক্তিশালিত্বের প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ?

উৎসর্গ-পত্রে মধুসূদন লিখিয়াছেন, "বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কারণ, তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি ও হইব, তাহা বলিতে পারি না।" ইহার উত্তরে আমরা বলি, তিনি আশাতিরিক্তভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং ইহার উপযুক্ত সমাদর ভবিষ্যৎ কালে অবশ্যম্ভাবী।

হে ক্ট র ব ধে র ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রথমেই চোখে পড়ে নামধাতুর প্রাচুর্য্য। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কাব্য-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকগুলি মধুসূদন নিজে গড়িয়া দিয়াছেন। বিশিষ্ট নামধাতুগুলির উদাহরণ দিতেছি।

'এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি'; 'পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না'; 'কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ' ( উৎসর্গপত্র ); 'সম্বোধিয়া কহিলেন'; 'মহাবাহু আকিলিস্ উত্তরিলেন' (=উত্তর করিলেন ); 'মুক্তি প্রদানিবেন'; 'এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে'; 'স্বদলবলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন'; 'মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন'; 'তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন'; 'এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন; 'রণস্থলে রণিতে (=যুদ্ধ করিতে) লাগিলেন'; 'হুহুঙ্কারিলে'; 'নিবেদিলেন'; 'বন্দিতে'; 'বাহিরিলেন;' 'উত্তরিলে (=উত্তীর্ণ হইলে )'; 'উদ্ভবিতে লাগিল'; 'শোভিতেছে'; 'ভাতিতে লাগিল'; 'আক্রমিয়া'; 'যুদ্ধিতে ছিলেন'; 'প্রসবিলেন;' ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার আছে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দুইটি ছাড়া তাহা কুত্রাপি ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে—'ত্রিপথা নদীত্রয়'

'সুধাময়ী নিশাকালে'। সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে ;-'রা' প্রত্যয়ান্ত বহুবচনের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। উদাহরণ—

'নারীকুল'; 'রাজাসমুহ'; 'বীরবৃন্দ'; 'শ্রোতৃনিকর'; 'দেবীদল', 'শলাকামালা', 'বাজীব্রজ', ইত্যাদি। 'দল' শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশেষণ শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ তাহা প্রথমা বিভক্তিতে অথবা অন্য বিশেষ্য শব্দ বা অসমাপিকার সহিত ব্যবহৃত হয়। হে ক্ট র ব ধে মধুসূদন এইরূপ স্থলে প্রায়ই তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাকে আঁট (condensed) করিয়াছে। যেমন, 'অতিদ্রুতে পলায়নপর হইতেছে"; 'থরথরে নড়িয়া উঠিল'; ইত্যাদি '-এ' প্রত্যয় দ্বারা করণ কারকের পদও সিদ্ধ করা হইয়াছে। যেমন 'উপাদেয় ভোজনপানসামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন'।

মধুসূদন 'সু', 'কু' এই দুই উপসর্গের ভক্ত ছিলেন। যেমন, 'কুরসনা', 'সুদেশে', ইত্যাদি। কাব্যোচিত বা প্রাচীন অপর প্রয়োগের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়। '-এ' প্রত্যয়ান্ত কর্ম্মকারকের পদ, যেমন, 'শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া'। মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের প্রয়োগ; যেমন, 'কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া'; 'কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া'; 'দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া'; ইত্যাদি। 'ভঞ্জন', 'বিন্ধন' প্রভৃতি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বদ্যোতক।

হে ক্ট র ব ধে র মধ্যে উপমার আতিশয্য আছে। এই উপমাগুলি প্রায় সকলই গ্রীক হইতে গৃহীত। মধুসূদন নিজেও খুব উপমা-প্রিয় ছিলেন। উৎসর্গ-পত্রের মধ্যেও তিনি উপমা ব্যবহারে ক্ষান্ত হয়েন নাই। যেমন, 'যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ

রহিল যে, সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।' অথবা উপক্রমণিকায়— 'যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি-উল্লিখিত তিনটী পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ-খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমরের ঈলিয়াস্‌স্বরূপ সঙ্গীত-তরঙ্গময় সিন্ধুপানে চলিতে লাগিল।'

হে ক্ট র ব ধে র ভাষার উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে মধুসূদন কিরূপ কৌশলে মূল গ্রীককে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুন্তনিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলক-প্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তা ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস্ স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্‌পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা একপার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেষ্বাস মানিল্যুস্ সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা শতখণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন যে, চিবুকনিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ণ করিতে লাগিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## বঙ্কিমচন্দ্র

রচনা-রীতির ক্রমবিকাশের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির এইভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা চলে।

১। সংস্কৃতঘেঁষা : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী। (খ্রীষ্টীয় ১৮৬৫—১৮৭০ সাল)।

২। প্রাকৃতঘেঁষা[১] : বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়[২]। (১৮৭২—১৮৭৪)।

৩। নিজস্ব-রীতি : ইন্দিরা[৩], রজনী, রাধারাণী[৪], কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম। (১৮৭৪-৭৫-১৮৮৮)। কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতও এই পর্য্যায়ে পড়িবে।

এই শ্রেণীবিভাগের নামকরণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। 'সংস্কৃতঘেঁষা' অর্থে যে রীতিতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য ও সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য এবং সংস্কৃতের ধরণে পদ-প্রয়োগ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। যে রীতি বা রচনা-পদ্ধতিতে তৎসম শব্দ ও সমাসযুক্ত পদের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম প্রয়োগ হইয়াছে, 'প্রাকৃতঘেঁষা'

---

১। এখানে 'প্রাকৃত' শব্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই। বাঙ্গালাভাষায় মূল-প্রকৃতি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি।

২। যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস নহে, বড় গল্প।

৩। অষ্টম সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণে ইন্দিরা-কে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পরিবর্দ্ধিত ইন্দিরা ঠিক উপন্যাসও নহে বড় গল্পও নহে, উহার মাঝামাঝি।

৪। রাধারাণী ও বড় গল্প।

অর্থে তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর যে পদ্ধতিতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমান সমান ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ অত্যল্প এবং যাহার বাক্যরচনা-রীতি সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শানুযায়ী, এক কথায় যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রীতি, তাহাকেই 'নিজস্ব-রীতি' বলিয়াছি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, যে সকল উপন্যাস পূর্ব্ব দুই শ্রেণীতে পড়ে তাহা বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য-পরিবর্জ্জিত। ইহা অনুমান করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গি তাঁহার প্রথম উপন্যাসেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল; তবে এই ভঙ্গি প্রথম ছয়খানি উপন্যাসে (যাহা আমি প্রথম দুই শ্রেণীতে ফেলিয়াছি) ক্রমপরিবর্দ্ধমান ভাবে দেখা যায়, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে উল্লিখিত গল্প ও উপন্যাসে সেই রীতি সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক রচনা-কালানুযায়ী পড়ে। রচনা-কাল হিসাবে ই ন্দি রা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কাল পরে ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ই ন্দি রা-র কথা বলিতেছি।

প্রথম শ্রেণীস্থ উপন্যাসগুলির ভাষা লইয়া প্রথমে আলোচনা করিব। এক একটি উপন্যাস লইয়া বিচার করিলে বঙ্কিমের রচনারীতির ক্রমবিকাশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে বলিয়া তাহাই করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দু র্গে শ ন ন্দি নী ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা মোটামুটি হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার আশ্রয়ী বলা যাইতে পারে। এমন কি দু র্গে শ ন ন্দি নী র ভাষা ভ্রা ন্তি বি লা সে র ভাষা হইতেও অধিকতর সংস্কৃতঘেঁষা। যেমন—

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্ন-কাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চন কান্তি

ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্ব স্রোতস্বতী জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল, নদী-পারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল, দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল ; কোথায় রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল ; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শশীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

'হেতু'শব্দের অর্থে '-প্রযুক্ত' ; অসমাপিকার অর্থে '-পূর্ব্বক', সঙ্গ, সঙ্গী অর্থে 'সমভিব্যাহার', 'সমভিব্যাহারী' ; পঞ্চমীর অর্থে '-প্রমুখাৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ সুপ্রচুর, 'বল্' ধাতুর প্রয়োগ নামমাত্র। 'সম্ভব', 'জিজ্ঞাস' শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতুর ও ছবি আঁকা অর্থে 'লিখ্' ধাতুর ব্যবহারও ভাষায় প্রাচীনত্ব-দ্যোতক।

সংস্কৃত অনুযায়ী তৎসম শব্দ বা সন্ধি প্রয়োগের উদাহরণ : 'অট্টালিকা আমূলশিরঃ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত' ; 'নদী কল কল রবে প্রবহণ করে' ; 'কালিদাসকে রত্নপ্রদা হইয়াছিলে' ; 'দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই' ; 'মধুদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ বায়ুহিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে' ; 'যখন যাহা প্রয়োজন তাহা ইচ্ছাব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন' ; 'ভানুদয় হইবে' ; 'আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া' ; 'তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন' ; ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় বইটিতে আগাগোড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাকে তাঁহার প্রথম যুগের রচনার বিশেষত্ব বলিয়া গণ্য করা চলে না। কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা' ; 'গৃহিণী যাদৃশী মান্যা' ; 'ধূলিধূসরা দেহলতিকা' ; ইত্যাদি।

সমাসের অসদৃশ আড়ম্বরের উদাহরণ : 'রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য-তৃষ্ণাকাতরলোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া' ; 'তবে তালগাছ কখনও

তাদৃশ গুরুনাসিকাভারন্যস্ত হয় না'; 'শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা'; 'অগণিত রজতদ্বিরদরদস্ফাটিক সামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালা ;' ইত্যাদি।

বাক্য-প্রয়োগরীতির বিসদৃশতা দু র্গে শ ন ন্দি নী র ভাষাকে কণ্টকিত করিয়াছে। এই দোষ উত্তরোত্তর কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা হইতে এই দোষ কখনই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রবন্ধাদির ভাষায় এই দোষ একেবারেই নাই, ইহা বলা চলে। দু র্গে শ ন ন্দি নী-তে বাক্যপ্রয়োগরীতির দোষ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'বোধ করি পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে'; 'এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না'; 'ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন'; 'দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে'; 'সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলুখাঁর যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল ;' 'আরোগ্য জন্মিতে লাগিল'; 'দেখিয়াছিলাম না', ইত্যাদি প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে হয়ত চলিত, এখন এইরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

অনেক স্থলেই সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 'আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়'; 'অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন'; 'বিমলা অপেক্ষা কোন্ নবীনা তোমার মনমোহিনী'? 'আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা'; 'এমত শ্রুত ছিলেন'; 'তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন।'

দু র্গে শ ন ন্দি নী-তে ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব নাই বটে; কিন্তু ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস হিসাবে ইহার মধ্যে যে পরিমাণ ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতির প্রাচুর্য্য আশা করা যাইত তাহার শতাংশের একাংশও নাই। উদাহরণ: 'তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয় দাও';

'আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি' ; 'সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন' ; 'আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব' ; 'বন্দিনীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম-প্রবেশও উত্তম।' ইত্যাদি।

বাক্যমধ্যে পদের অস্থানে প্রয়োগ দু র্গে শ ন ন্দি নী-তে অপ্রচুর নহে। যথা—'আয়েষা সেইরূপ জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন' ; 'আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন ;' ইত্যাদি।

দু র্গে শ ন ন্দি নী-র ভাষায় আর একটি মহৎ দোষ আছে। এই দোষ বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শেষের দিকের রচনায় এই দোষের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। ইহা আর কিছুই নহে, কথোপকথনের ভাষায় মৌখিক ও লৈখিক[১] ক্রিয়াপদের একই বাক্যের মধ্যে বা একই ব্যক্তির উক্তির মধ্যে একত্র প্রয়োগ। এই শৈথিল্যের জন্য অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে দায়ী নহেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার মধ্যেও এই দোষের উদাহরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহার কারণও আমি যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনায় ইহার মাত্রাধিক্য হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি আরও সাবধান হইতে পারিতেন।

এই প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি ?' 'অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ওত কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না' ; 'সাধ করিয়া কি তোমায় রসরাজ বলেছি ?' অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

১। শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই উপযোগী-শব্দটির স্রষ্টা।

দু র্গে শ ন ন্দি নী-র ও প্রথম যুগের অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে রচনা-পদ্ধতির দুইটি স্তর একত্র বিদ্যমান দেখা যায়। একটি সংস্কৃতানুযায়ী বা 'বিদ্যাসাগরী' পদ্ধতি, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বা 'বঙ্কিমী' পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না, এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। দু র্গে শ ন ন্দি নী-র বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতে রচিত। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব যাহাই থাকুক, তাঁহার নিজের রীতি এই বিদ্যাসাগরী রীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাস কয়খানি স্থূলতঃ বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতেই রচিত। দু র্গে শ ন ন্দি নী হইতে এই পদ্ধতিতে রচিত কিছু অংশ পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, এখন আরও কিছু দিতেছি।

শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লবসকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গল-বর্ণ দেখাইতেছিল, কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইতেছে, আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত, দূরে অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমত সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিতপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

দু র্গে শ ন ন্দি নী প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় ১৮৬৭ সালে ক পা ল কু ণ্ড লা প্রকাশিত হয়। এই দুই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-রীতি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন লাভ করে নাই। ক পা ল কু ণ্ড লা-র ভাষা ঠিক দু র্গে শ ন ন্দি নী-র ভাষার ন্যায়। তবে ইহাতে ভাষার গতি দ্রুততর হইয়াছে, এবং ভাষা মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতরীতিকণ্টকিত হইলেও বাক্যপ্রয়োগের বিসদৃশতা একেবারে নাই বলিলেই হয়। আর বিষয়োপযোগী

হওয়াতে রচনা-রীতির দুরূহত্ব এই আখ্যানকাব্যটির সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধনই করিয়াছে।

স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য-পদের সম্বোধনে সংস্কৃত রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'কপালকুণ্ডলে!' দু র্গে শ ন ন্দি নী-তেও এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগও পূর্ব্বের মত বলবৎ রহিয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতু ও 'বর্ণ', 'ভ্রম', 'জিজ্ঞাস', 'সম্ভব', প্রভৃতি নামধাতুর প্রয়োগও বেশ সজাগ রহিয়াছে।

মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে, তবে দু র্গে শ ন ন্দি নী-র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। এই পুস্তকেই বঙ্কিম-চন্দ্র সর্ব্বপ্রথম 'এলেন', 'পড়লেম', প্রভৃতি '-লেম' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ মৌখিক ভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ পদগুলি বোধ হয় নাটকীয় ভাষার প্রভাবে আসিয়া গিয়াছিল।

বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য ক পা ল কু ণ্ড লা-য় লক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। একটিমাত্র উদাহরণ আমার চোখে পড়িয়াছে,—'কাপালিক কুটীর মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে।'

সংস্কৃতবৎ বাক্যপ্রয়োগরীতিও ইহাতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 'একমাত্র উপায় হইতে পারে—সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে'; পারিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই'; 'মদনরসে টলটলায়মান': 'তথায় পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধন-লক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন'; ঔপনগরিক ভাগে'; 'ঈশ্বরপ্রসাদাৎ'; ইত্যাদি।

সমাসযুক্তপদ অনেক সময় রচনার মধ্যে খাপ খায় নাই। উদাহরণ, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল'; 'তদ্বর্ত্মসংবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই'; 'মেহের উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি'; 'সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে

পড়িলেন'; 'কেবল কদাচিন্মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব্দ'; ইত্যাদি।

গ্রন্থমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া অক্লেশে গৃহীত হইতে পারে।

ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধি করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া, ইঁহার চরিত্র পরমপবিত্র। ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস মৃ ণা লি নী খ্রীষ্টীয় ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। ক পা ল কু ণ্ড লা প্রকাশের দুই বৎসর পরে রচিত(?) ও প্রকাশিত হইলেও ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ইহা ক পা ল কু ণ্ড লা-র তুলনায় যথেষ্ট অমার্জ্জিত রচনা বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় যেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর শক্তি কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র মৃ ণা লি নী-তে পূর্ব্ব দুই উপন্যাসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভব পদ ও কথ্য বাক্যরীতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই উপন্যাসটিতে তাঁহার রচনারীতি নিজস্ব পদ্ধতির দিকে বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণের মৃ ণা লি নী-র ভাষা যে আরও কত অধিক অমার্জ্জিত ছিল তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। প্রথম সংস্করণ হইতে (পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিবর্জ্জিত) প্রথম দুই পরিচ্ছেদ অবলম্বনে এই আলোচনা করিতেছি।

অযথা সন্ধি ও সমাস অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে। যেমন, 'উৎসবের জন্য দিনাবধারিত করিলেন'; 'চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফূরৎ

হইতে লাগিল' ; 'সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্ন' ; 'আরোহীরা কি বা তচ্চালনকৌশলী' ; ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত বাক্যটিতে 'কানে কানে' এই তদ্ভব বাক্যাংশের তৎসম রূপ 'কর্ণে কর্ণে' ব্যবহার করাতে অর্থদোষ ঘটিয়াছে—'তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন।'

সংস্কৃতভাষার অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব নাই। যেমন, 'তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল।'

এই সকল দোষ পরিমার্জ্জিত সংস্করণের মৃ ণা লি নী-তে পাওয়া যায় না। সে হিসাবে মৃ ণা লি নী-কে অনেকটা দ্বিতীয় যুগের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'সম্ভব', 'সাধ', 'তিষ্ঠ', প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ খুবই আছে। 'কহ্', ও 'বল্' ধাতু তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর কথোপকথনে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সংস্কৃতঘেঁষা রীতিতে লিখিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। অকালজলোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

বি ষ বৃ ক্ষ বাঙ্গালা ১২৭৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭২-৭৩) সালে ব ঙ্গ দ র্শ ন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে ই ন্দি রা-ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বি ষ বৃ ক্ষে র বিষয়-বস্তু অভিনব ও আধুনিক, এবং ইহার ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভবমূলক বা প্রাকৃতঘেঁষা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র এখনও সংস্কৃতরীতিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজস্ব রীতি এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া উঠে নাই। সংস্কৃতানুগ বাক্যপ্রয়োগরীতি এখনও বেশ বর্ত্তমান। যেমন,—'আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল' ; 'গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ

অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল'; ইত্যাদি। তৎসম শব্দের ও সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার প্রায়ই রচনার সৌন্দর্য্যকে ব্যাহত করিয়াছে। যেমন,—'তোর এই বালিকাবয়ঃ'; 'মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে'; ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয়ের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেমন, 'চাঁপা বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল'; 'বিচিত্রা মালা'; 'অস্ফুটবাচা বালিকা'; 'এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল'; 'প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা'; 'সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা'; 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায়'; ইত্যাদি। এই স্ত্রীপ্রত্যয়প্রিয়তা দুই এক স্থলে ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ'। (তবে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের মধ্যে এইরূপ স্ত্রীত্ববোধক পুংলিঙ্গ রূপের শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণদুষ্ট পদ বলা চলে না।)

'করত' প্রভৃতি পদের ও '-পূর্ব্বক' শব্দের দ্বারা '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে। 'তিষ্ঠিতে,' 'সিঁয়াইতে,' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে। যেমন, 'তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয়দিন থাকিতে পারিব?' 'এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি'; 'আমা হ'তে পবিত্র নয়'? ইত্যাদি। শ্রুতিকটু ইংরেজী ধরণের বাক্য প্রয়োগ খুবই কম আছে। একটি উদাহরণ দিতেছি,—'চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল'।

লৈখিক ও মৌখিক ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ ত আছেই, উপরন্তু 'খেতেছে', 'করতেছে', 'হলেম', প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। বি ষ বৃ ক্ষে কতকগুলি ফারসী ও ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও করা হইয়াছে। বিষয়-বস্তু আধুনিক কালের (অর্থাৎ রচনা সময়ের হিসাবে আধুনিক কালের,

আন্দাজ ১৮৬৫ সালের দিকের ) বলিয়া ইহাতে তৎকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অযুক্ত হয় নাই। যথা,—'লিবরালিটি'; 'লোহার রেইল'; 'ফ্লুটেড থাম'; 'রিফরম'; 'ক্যানবাস ব্যাগ'; ইত্যাদি। এইরূপ কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা শব্দের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'সোপ-হস্তে'; 'প্রাচীন গীত কোট করিয়া'; 'টিকিট মারিয়া'; 'কমিটী করিয়া'; 'কমিটীতে বসিয়া গেল'; ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে এতাদৃশ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

বি ষ বৃ ক্ষে সংস্কৃতঘেঁষা রচনার অসদ্ভাব নাই, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব পদ্ধতির প্রভাবে পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলির ভাষার ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। বি ষ বৃ ক্ষ হইতে এই রচনার উদাহরণ হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রূপদর্শন-জনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়া প্রকাশ পায়।

চ ন্দ্র শে খ র ব ঙ্গ দ র্শ নে বাঙ্গালা ১২৮০ ( খ্রীষ্টীয় ১৮৭৩-৭৪ ) সালে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। আমি প্রথম সংস্করণের চ ন্দ্র শে খ র দেখি নাই, সুতরাং সংশোধিত সংস্করণ লইয়াই এই আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চ ন্দ্র শে খ রে র মধ্যে বাক্যপ্রয়োগরীতির গলতি একেবারেই নাই। তবে মৌখিক ও লৈখিক ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আছে বটে। এই পুস্তকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম 'কলুম' ইত্যাদি ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের কথ্য-ভাষার পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাবে মৌখিক ভাষার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট, এমন কি তদ্ভব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণেও স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন,—'হৃষ্টপুষ্টা একটি গাই চরিতেছে'।

'সম্ভবে,' 'মোহিয়াছে,' 'শোভিতে লাগিল,' ইত্যাদি কাব্যসুলভ নাম-ধাতুর প্রয়োগ অল্পস্বল্প দেখা যায়। সমাসের জটিলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি সমাসযুক্ত পদের অসদ্ভাব নাই। দুইটির অধিক পদ লইয়া সমাস খুব বেশী নাই। যেমন,—'পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখা-রাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত।'

সংস্কৃতানুগ পদ্ধতি এখনো পরিত্যক্ত হয় নাই। যেমন,—'তদ্বৎ সুকুমার বন্যকুসুম'; 'সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল'; 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন'; 'শৈবলিনীকলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে'; 'লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়'; ইত্যাদি।

সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

শব্দসাগর মন্থন করিয়া কত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতা-নিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

র জ নী বাঙ্গালা ১২৮১ ( খ্রীষ্টীয় ১৮৭৪-৭৫ ) সালে ব ঙ্গ দ র্শ নে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার শেষ চারিখণ্ড বহুল পরিমাণে পরিবর্জ্জিত ও পুনর্ল্লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের অভাবে এই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ লইয়াই আলোচনা করা হইতেছে।

র জ নী-র ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতির সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই পুস্তকে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব-রীতি সম্বন্ধে পূরামাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহাতে 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। পরবর্ত্তী উপন্যাস-গুলিতেও তদ্রূপ। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ কম

হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট কম।[১] 'বর্ষে', 'উছলিত,' প্রভৃতি কাব্যসুলভ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। নিম্নে উদ্ধৃত স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর '-কে' প্রত্যয়ের অভাব লক্ষণীয়—'আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব' ; 'আমি শচীন্দ্র চাহিতাম'।

তদ্ভব শব্দকে তৎসমরূপে ব্যবহার করায় একস্থলে বিষম অর্থদোষ ঘটিয়াছে ;—'তাহার কঙ্কাল (=কাঁকাল) হইতে দাখানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম।' 'সুতরাং' শব্দের সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়—'যদি শান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।' নিম্নলিখিত বাক্যে 'বলিয়া থাক' এই অর্থে 'বলিয়াছ' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয় ;—'যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।'

কৃ ষ্ণ কা ন্তে র উ ই ল বাঙ্গালা ১২৮৪ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৭-৭৮) সালে ব ঙ্গ দ র্শ নে বাহির হয়। ইহার রচনারীতি র জ নী হইতেও বেশী পরিমাণে প্রাকৃতঘেঁষা! স্ত্রী-প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ (অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের হিসাবে) একস্থলে পাইয়াছি,—'হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ!' ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও কিছু কিছু আছে। 'তিনি হাপ-পর্দ্দানসীন'—এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী শব্দটিকে বাঙ্গালা শব্দে পরিণত করিয়াছেন। সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য মোটেই নাই, দৈবাৎ উপমাদির স্থলে পাওয়া যায়। যেমন, 'নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায়'। মৌখিক ও লৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

উক্তি-প্রত্যুক্তির বাহুল্য ও ঘটনার দ্রুতগতি কৃ ষ্ণ কা ন্তে র উ ই লে র ভাষাকে লঘুগতি ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছে। কৃ ষ্ণ কা ন্তে র উ ই লে সংস্কৃতঘেঁষা রচনাপদ্ধতি যে কতটা সরল ও লঘু হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

---

১। ইহা অবশ্য পুনর্লিখনের ফল হইতে পারে।

গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সে ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন।

অথবা—

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্তভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।

রা জ সিং হ বাঙ্গালা ১২৮৫ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৮-৭৯) সালে প্রকাশিত হয়। ইহাও প্রথম বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটির কলেবর যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র রা জ সিং হে র ভাষার সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

রা জ সিং হে র ভাষা বেশ সরল হইলেও পূর্ব্ব দুইটি উপন্যাসের ভাষার তুলনায় অমসৃণ (crude) ও অপরিমার্জ্জিত (careless) বলিয়া বোধ হয়। ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

অনুপযুক্ত স্থলে তৎসম পদ বা সমাসের ব্যবহার এবং তৎসম-প্রচুর বাক্যের মধ্যে তদ্ভব, দেশী, বা বিদেশী শব্দের প্রয়োগ রচনাকে স্থানে স্থানে তুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। যেমন, 'কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া'; 'নয়ননামা গিরিসঙ্কটে;' 'প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল;' ইত্যাদি।

সমাসযুক্ত তৎসম শব্দের প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে রচনার ভারসমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যেমন, 'অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল'; 'বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরথের ন্যায়'; 'পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী'; ইত্যাদি।

'সম্ভবে', 'উছলিতেছে', 'ভ্রমিতেছিলেন', 'শোভিতেছিল', ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আরও কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই।

আ ন ন্দ ম ঠ বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ১২৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮০-৮২) সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে ইহা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল। তথাপি ভাষার দোষ ইহাতে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে'; 'এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না'; 'ভবানন্দের কাছে এসব কারণ অনুপস্থিত'; 'যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও; আমি যাইতেছি'; ইত্যাদি। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার অল্প।

দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কিছু কিছু আছে। যেমন, 'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ'; 'উষামুকুটজ্যোতিঃসন্দর্শনে আহ্লাদিত'; ইত্যাদি।

সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি। অনন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

দে বী চৌ ধু রা ণী-র কিয়দংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে ১২৮৮ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮১-৮২) সালে প্রকাশিত হয়। আ ন ন্দ ম ঠ প্রকাশিত হইবার পর ইহা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়।

আ ন ন্দ ম ঠ রচনার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। দে বী চৌ ধু রা ণী-তে তাহা স্ফুটতর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপন্যাস তিনটির ভাষার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখেন নাই, ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে ইংরেজী অনুকরণ-জনিত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঘটিত দোষ পরিলক্ষিত হইবে।

'যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই!' 'পাঁচ বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে (=শাণাইতে) হইবে'; 'কাপড়ের ব্যাপারীরা কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল।'

স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য আবার দেখা গিয়াছে। যেমন,—'শিষ্যাকে নিযুক্তা করিলেন'; 'কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী'; 'সপ্তমী প্রায়াগতা'; ইত্যাদি। মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ—যাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল—তাহা আবার বাড়িয়াছে।

সী তা রা ম খ্রীষ্টীয় ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে প্র চা র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। আ ন ন্দ ম ঠ ও দে বী চৌ ধু রা ণী -র তুলনায় ভাষা বেশ সরল হইলেও রচনা আরও অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন,—'অশ্বী বড় তেজস্বিনী'; 'বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী'; 'বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায়'; 'আশা নিষ্ফলা হইবে না'; 'পুরী কম্পিতা হইল'; ইত্যাদি।

'না হইয়াছিলেন'; 'না দেখিয়াছিলেন'; 'বিধেয় হয় না (=নহে)'; ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট না হইলেও অপপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে। 'জমিদারির খাজানা পূর্ব্বমত রাজকোষাগারে পৌছিয়া দিতে লাগিলেন'—এ স্থলে 'পৌছাইয়া'র পরিবর্ত্তে 'পৌছিয়া' লেখা ভুল। দে বী চৌ ধু রা ণী-তে ও 'শাণাইতে' স্থলে 'শাণিতে' পাওয়া গিয়াছে। 'সেকালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল'; 'তটিনী বাহিত হইতেছিল'; ইত্যাদি প্রয়োগ ভাল বাঙ্গালা নহে।

'নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল';—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতির হিসাবে এই বাক্যটি দুষ্ট।

'রমা বড় ছোট মেয়েটি'—ইহাও শ্রুতিকটু। 'প্রেম যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে'—ইহা ইংরেজী অনুবাদ-গন্ধী। 'কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম'—এস্থলে 'তিনি' এই পদটি 'তাঁহার' হওয়া উচিত ছিল।

উপন্যাসগুলির তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলির ভাষা অধিকতর মার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় যুগের প্রবন্ধগুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয়ের আধিক্য দেখা যায়।[১] যেমন,—'মনোমোহিনী কথা'; 'কাতরতাশূন্যা ভাষা'; 'সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টি'; ইত্যাদি। শেষযুগের প্রবন্ধের, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ভাষাকে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব-রীতির বিশেষত্ব কি তাহা আলোচনা করিব। পূর্ব্বে একাধিবার বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির মূলে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারা যায়, যাহা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া বোধ হইবে। যেমন,—'পূর্ব্বকালে উত্তর বাঙ্গালায় নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন' [ দেবীচৌধুরাণী ]। এই উদাহরণটি আমি যদৃচ্ছাক্রমে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়াই কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে বঙ্কিমী রীতি বলিয়া কিছু নাই, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য বিশেষ কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা (সাহিত্যের) গদ্যের জনকতুল্য, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান পোষ্টা। পোষ্টার কৃতিত্ব জনকের কৃতিত্ব হইতে কিছু মাত্র অল্প নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালা গদ্য তাহার চরম রূপ প্রাপ্ত

---

১। দুই এক স্থলে এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'চন্দ্রবিযুক্তা নিশীথে'; 'নরোত্তম কৃষ্ণকে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিতে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।' [ বিবিধপ্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড ]।

হইল। ( ভাষার চরমরূপ বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কেন না ভাষা পরিবর্ত্তনশীল, আর সাহিত্যিকের প্রতিভাও অনন্ত দিকে প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতরাং ভাষার বা রচনাভঙ্গির বিভিন্ন রূপ হইয়াই থাকে। এখানে চরম রূপ অর্থে বাক্যের গঠন ও কার্য্যোপযোগিতাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। ভাষা অল্পবিস্তর বদলাইলেও সাহিত্যের ভাষায় বাক্যের কাঠামো অনেকদিন ধরিয়া অবিকৃত থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের গদ্যের কাঠামো বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক গঠিত ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত এবং পরিমার্জ্জিত হয়; পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। )

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এইগুলি—

[ ১ ] বাক্যগুলি ছোট ছোট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল ( clipped, simple sentences )।

[ ২ ] সংযোজক অসমাপিকার ( conjunctive-এর ) অব্যবহার, ও তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

[ ৩ ] নিশ্চয়াত্মক ( affirmative ) বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক ( interrogative ) বাক্যের ব্যবহার।

[ ৪ ] মধ্যে মধ্যে পাঠকের অথবা বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অথবা চিন্তাকুলতার হেতু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ। এই প্রয়োগটি রচনাকে সরস (interesting) ও বাক্যভঙ্গিকে বিশ্রদ্ধ (intimate) করিয়া তুলিয়াছে।

[ ৫ ] পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের রচিত আখ্যায়িকায় লেখক কথকের স্থান অধিকার করিতেন, অর্থাৎ তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার নিকট কোন ব্যাপার বা কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। অথবা যেন কোন ঘটনা নথীভুক্ত ( record ) করিতেছেন বা রিপোর্ট লিখিতেছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক যেন কোন বন্ধুর সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন বা বিশ্রদ্ধ-ভাবে কথোপকথন করিতেছেন। এখানে গল্প বা কাহিনীটা মুখ্য নহে,

যাঁহাকে বলা হইতেছে তাঁহাকে পরিচর্য্যা (entertain) করাই যেন লেখক বা বক্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পদ্ধতিতে কাহিনীটা মুখ্য, শ্রোতা গৌণ ( in the background ), এই পদ্ধতিতে পাঠকই মুখ্য। এইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রধান বিশেষত্ব। প্রধানতঃ ইহাই তাঁহার রচনাকে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের রচনা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

[ ৬ ] একই বাক্যের অথবা একই কর্ত্তৃপদ কিম্বা একই ক্রিয়াপদ-সংবলিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি। ইহাও রচনায় সরসতা, আন্তরিকতা ও বিশ্রদ্ধভাব আনয়ন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী-তে ইহা কিরূপভাবে দেখা দেয়, এবং পরবর্ত্তী উপন্যাস ও গল্পগুলিতে ইহা পরপর কিরূপভাবে ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য লাভ করে তাহা দেখাইবার জন্য আমি প্রত্যেক উপন্যাস হইতে ক্রমহিসাবে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কিনা কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে? [ দুর্গেশনন্দিনী ]।

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গম্ভীর ১ চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফা-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে। [ কপালকুণ্ডলা ]।

গারিকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে

১। গম্ভীর?

বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। [ মৃণালিনী ]।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশবাবু প্লাণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারী, শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।১ [ বিষবৃক্ষ ]।

হিরন্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরন্ময়ীর হইতে পারিত। ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরন্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া, পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্টিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে ?" [ যুগলাঙ্গুরীয় ]।

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি ? এই সসাগরা নদনদী-চিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি ? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি ? [ রাধারাণী ]।

তুমি জড়-প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্ব সুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ! তোমাকে নমস্কার। [ চন্দ্রশেখর ]

আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখপ্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না ; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা

---

১। এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-বলার পদ্ধতির ( narrative style-এর ) একটি সুন্দর উদাহরণ।

শুনাইতে পারিলাম না। সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমূল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমূল বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে? [ রজনী ]

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয় গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না, কোনও সংবাদ আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। [ কৃষ্ণকান্তের উইল ]

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য—কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্ল-কমল তুল্য তাহার নব বয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই, বেশ নাই, আহার নাই—তবু সে প্রদীপ্ত অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। [ আনন্দমঠ ]।

তা কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কা'ল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কা'ল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা, সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। [ সীতারাম ]।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি।

যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটি কতকটা যদি সত্য বলিয়া বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা। [ বাঙ্গালীর কলঙ্ক ]।[১]

১। প্রচার, প্রথম বৎসর, ১৮৯১-৯২ সাল, পৃঃ ৬৭।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভাষা ইতিপূর্ব্বে খুঁটিয়া আলোচনা করিয়াছি। এইবার এই সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা কথা বলিব।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় খুব প্রচুর পরিমাণে এবং সর্ব্ববিধ ও সর্ব্বসময়ের রচনায় দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিধেয়-বিশেষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও করিয়াছেন। উদাহরণ পূর্ব্বেই যথেষ্ট দিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসগুলিতেই কবিতার ভাষার ছাপ কিছু কিছু পাওয়া যায়—'আমা হইতে', 'তোমা বিনা', ইত্যাদি প্রয়োগে ও 'সম্ভবে', 'উছলিত', 'ভ্রমিয়া', 'মোহিয়াছে', 'বর্ণিত', ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।

'প্রহরেক', 'বৎসরেক', 'ক্রোশেক', ইত্যাদি 'এক' শব্দের সহিত সমাসান্ত পদও সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ-সমাসযুক্ত পদের সহিত উপমাদ্যোতক '-বৎ' প্রত্যয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, 'অনাহ্লাদজনিতবৎ'; 'কুসুমমালাবৎ'; 'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ'; ইত্যাদি।

'নহে', 'নয়'—ইহার স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র 'না' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব হেতুই হইয়াছে। যেমন, 'তামাসা না'; 'তা না'; ইত্যাদি।

'হাসিতেছিল না'; 'হইতেছিল না'; 'জন্মিতেছিল না'; 'করিতেছিল না'; 'বলিতেছিলাম না'; ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার রীতিতে এই প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না;—'হাসি নাই', 'হয় নাই', ইত্যাদি প্রয়োগই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

'বল্' ও 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ প্রথমদিককার লেখায় দেখা যায়। দু র্গে শ ন ন্দি নী ও ক পা ল কু ণ্ড লা-য় 'কহ্' ধাতুরই প্রাবল্য। শেষের দিককার রচনায় 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না।

'গাহিতে' এই ক্রিয়াপদ 'গায়িতে' এইরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ 'গাইতে' এইরূপ পাওয়া যায়। 'চাহিতাম', 'চাইতাম' রূপেও দেখা যায়। 'লইয়া' স্থলে 'নিয়া' এই রূপই শেষের দিকের রচনায় কথোপকথনের ভাষা ছাড়াও অন্তত্র যথেষ্ট দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্প। আর তাহাও নেহাত আবশ্যক স্থল ছাড়া করা হয় নাই। ফারসী শব্দের সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে।

• এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অপর কতিপয় দোষের কথা কিছু বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-প্রত্যয়ের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্ত্রীপ্রত্যয়-প্রিয়তা তাঁহাকে অনেক সময় ব্যাকরণদুষ্ট পদের প্রয়োগ করাইয়াছে। ইহার একাধিক উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি।

• কথোপকথনের মধ্যে মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দোষ। প্রথম যুগের রচনায় ইহা যতটা দেখা যায় পরবর্ত্তী যুগের রচনায় ততটা দেখা যায় না ইহা সত্য বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন রচনা ( 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি দুই একটি প্রবন্ধ ছাড়া ) এই দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে।

• অযথা সমাস করা আর একটি বড় দোষ। ইহার জন্য রচনার গুরুত্ব মধ্যে মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেমন, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল'; 'পরমাহ্লাদিত হইত'; 'তাহাতে কালাপহৃত হয়'; 'সপ্তমী প্রায়াগতা'; 'পরমোপকার'; 'উত্তমাসনে বসাইলেন'; 'প্রকাণ্ডাকার'; 'তচ্ছাসিত-প্রদেশ'; ইত্যাদি।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

## বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও শিষ্যস্থানীয় সাহিত্যিকবর্গ

দীনবন্ধুর নাটক ছাড়া গদ্য-রচনা দুইটি মাত্র পাওয়া যায়—(১) যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, এবং (২) পোড়া মহেশ্বর। গ্রন্থকার প্রথমটিকে উপন্যাস আখ্যা দিলেও ইহা ব্যঙ্গ-কৌতুক জাতীয় বড় গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড় এই জাতীয় রচনা। ইহা প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শনে[১] প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে চলিতভাষার পদ ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণ থাকাতে বিষয়-বস্তুর বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে রচনাটির ভাষা কিরূপ সরস তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আধুনিক পাঠক-সমাজে দীনবন্ধুর এই গল্পটির বিশেষ প্রচার নাই দেখিয়া একটু বেশী অংশই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলী: ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়কারোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নাসিকাটি লম্বা, অল্প মঙ্গোলিয়ান কট বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানাবর্ণের চিকুর, গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারী করা হয়। গলায় সুবর্ণ-তারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বীচিসদৃশ অক্ষমালা; বাহুতে ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্তচন্দনের কৌটা, আঙ্গুলে একটী রজত, একটী কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলীর যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটি। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সঙ্কীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুণকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটী স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতা হেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে

---

১। ১২৭৯ সাল, কার্ত্তিক সংখ্যা।

সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারী দোরস্ত। কুড়রাম কিছুদিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটোয়ারী-গিরী কর্ম্ম করিয়া একবার মাত্র নিকেশী দেনায় জমিদারদিগের চূণের গুদামে এবং বারত্রয় মাত্র সরকারী জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

*পোড়া মহেশ্বর* গ্রাম্য প্রবাদ লইয়া রচিত গল্প। ইহা ব্যঙ্গ রচনা না হইলেও, হাস্যরসপ্রধান। ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা। উদাহরণ—

সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্ত করেন না, দিবাবিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে রবশূন্য বদনে, অবিচলিত চিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষের দিকের লেখকদিগের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। ইনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল লেখার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে ইহাঁর একটি রচনার উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষ্ণকমল *অবোধবন্ধু* পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে (১২৭৫-১২৭৬ সালে) ফরাসী হইতে একটি উপন্যাস বা আখ্যায়িকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। আখ্যায়িকাটির নাম *পৌল ভর্জ্জীনী*। এই অনূদিত কাহিনীটি বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এ কথা রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি*-তে উল্লেখ করিয়াছেন। *পৌল ভর্জ্জীনী* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সাধারণ পাঠক এই রচনাটির সহিত পরিচিত নহেন। যে রচনা বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁহার মনে অল্পস্বল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু পরিচয় থাকা উচিত। সুতরাং আখ্যায়িকাটির প্রথম অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মরীশশ দ্বীপের রাজধানীর নাম লুইবন্দর নগর। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে দুটী জীর্ণ ভগ্ন কুটীরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

সেখানকার ভূমির ভাব দেখিলে স্পষ্ট মনে হয় যে পূর্ব্বে এই স্থানে কৃষি কর্ম্ম হইত। যে উচ্চ ভূমির উপর পর্ণশালা দুটী হইয়াছিল, তাহার চারিধারেই পাহাড়, কেবলমাত্র উত্তর দিকে তথায় যাইবার প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটী পথ আছে। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া ডানিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে 'আবিক্রিয়া শিখর' নামক পর্ব্বতচূড়া দৃষ্ট হইয়া তদনন্তর লুইবন্দর নগর পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নয়নগোচর হয়। বামভাগে দেখা যায় যে, 'বাতাবি কুঞ্জ' নামক পল্লিতে যাইবার পথ রহিয়াছে, এবং সেই পথের প্রান্তভাগে 'বাতাবি গিরিজা' নামক দেবালয় চতুর্দ্দিকে বেণুবন পরিবেষ্টিত থাকি[য়া] কতদূর পর্যান্ত আপনচূড়া প্রদর্শন করিতেছে। আর ঠিক্ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, সমুদ্রের তীরে 'দুরন্ত' নামক অন্তরীপ, উহার দক্ষিণাংশে অগাধ পয়োনিধি বিস্তারিত রহিয়াছেন, শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ তাঁহার বক্ষস্থলে ভাসিতেছে এবং তন্মধ্যে 'চিত্ত উদ্যোগ' নামক যে একটী দ্বীপ আছে, উহার আকার দেখিলে জ্ঞান হয় যেন সমুদ্রের উপর কেহ একটী বুরুজ গড়িয়া রাখিয়াছে।[১]

কৃষ্ণকমলের ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ১২৯১ সালের ভা র তী-তে প্রকাশিত "সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সভ্যতা কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। আমাদিগের বোধ হয় যে সেই আভাস নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে যে নরজাতির বাস অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মন, স্পেনীয়, ও ইটালীয় এই পাঁচ জাতিকে আমরা সভ্যতা-মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞান করি। আফ্রিকা ও আমেরিকার কতিপয় জাতি সেই মঞ্চের অধস্তন শ্রেণী অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবেক! পাঠকবর্গ মনে মনে রাগ করিবেন না যে আমরা স্বজাতি অর্থাৎ হিন্দু-জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারিলাম না। তাঁহারা হয়ত মনে মনে ভাবিবেন "কি আমরা আসল আর্য্যজাতি হইতেছি আমাদিগের মধ্যে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির পুরুষরত্ন সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নহি।" সত্য, কিন্তু ইহার উত্তর এক কথায় হয়, সভ্য যে জাতি, সে কখন পরাধীন হইবার নহে, অথচ দেখা যাইতেছে যে আমরা অদ্য আটশত বৎসর হইল বৈদেশীকদিগের দ্বারা শাসিত হইয়া

১। অবোধবন্ধু, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৭৫ সাল, পৃঃ ১৪২-১৪৩।

আসিতেছি। এই একটী বিষয়ই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খাট করিবে।১

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ব ঙ্গ বি জে তা ১২৮১ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৪ সালে জ্ঞা না ঙ্কু র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাঁর শেষ উপন্যাস স মা জ ১৩০০ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৯৩) সালে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ছয়টি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ঐতিহাসিক ও ছদ্ম ঐতিহাসিক এবং (২) সামাজিক। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভাষা একটু বেশী রকম সংস্কৃতঘেঁষা। ইহাতে কথোপকথনগুলি প্রায়ই সাধুভাষায় দেওয়া হইয়াছে। 'স্বামিন্', 'প্রভো' প্রভৃতি সংস্কৃতোচিত সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়সংবলিত বিশেষণ পদের অসদ্ভাব না থাকিলেও বিশেষ বাড়াবাড়ি নাই। 'সুরূপা পুত্রবধূদ্বয়' ইত্যাদি বাঙ্গালাব্যাকরণ-বিরুদ্ধ স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার দুই একটি পাওয়া যায়। বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বিশেষণের প্রয়োগ একটি বড় বিশেষত্ব। যেমন,—'ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর না হইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কয়েকদিন হইতে যে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন', ইত্যাদি।

সামাজিক উপন্যাস দুইখানি মাত্র, সং সা র ও স মা জ। সং সা র ১২৮২ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫) সালে প্রকাশিত হয়। ইহা রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। এই দুইখানির ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সরল। কথোপকথন বেশীর ভাগ কথ্যভাষাতেই দেওয়া হইয়াছে। কথ্য ভাষায় সহিত লেখ্য ভাষার মিশ্রণ খুবই কম দেখা যায়। 'চাষাগণ', 'তিনজন খুড়শাশুড়ীরাই গিন্নি', প্রভৃতি দুষ্ট প্রয়োগ দুই একটি আছে। ইংরেজি প্রভাব লক্ষণীয় নহে। দুই এক স্থলে যাহা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বাঙ্গালার রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন, 'রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন?' 'প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা।'

১। ভারতী, ১২৯১ সাল পৃঃ ১৬১।

'আসতেম', 'পেলেম', 'করতাম', প্রভৃতি কথ্যভাষায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। 'গেল' এই পদের পরিবর্ত্তে 'যাইল' এই পদের মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

রমেশচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কতক পরিমাণে নমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আওতায় পড়িয়াছিলেন বলিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সময়ে—এমন কি এখনকার কালেও উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস অথবা চিত্র দুইটি বাঙ্গালা ভাষায় তৃতীয়-রহিত বলিলে মোটেই অসঙ্গত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে ইহার জোড়া নাই। রমেশচন্দ্রের রচনার নমুনা হিসাবে দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি সাধুভাষার উদাহরণ, দ্বিতীয়টি কথ্যভাষার।

সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাক্যশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থ হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। যথার্থই বোধ হয় যেন, সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতার শৈবালে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্রকুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়াবর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর। [ মাধবীকঙ্কণ ]।

তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবতে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারী চাকরী, এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বে'র ভাবনা? এই রসো না, তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি এমন সম্বন্ধ ক'রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করেছে, বে দিলেই এখনি মাথায় ক'রে নিয়ে যায় তা আমি গা করিনি। [ সংসার ]।

সঞ্জীবচন্দ্র ব ঙ্গ দ র্শ নে প্রথমে যা ত্রা নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১] মা ধ বী ল তা উপন্যাস এবং পা লা মৌ প্রবন্ধও ব ঙ্গ দ র্শ নে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] ক ণ্ঠ মা লা, জা ল প্র তা প চাঁ দ এবং রা মে শ্ব রে র

১। দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৮০ সাল। ২। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষ, ১২৮৫-৮৮ সাল।

অ দৃ ষ্ট ও দা মি নী শীর্ষক গল্প দুইটি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভ্র ম র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তৎসত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। তাঁহার নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার রচনার সকল দোষত্রুটিকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যাবৎ গুণ সকলই আছে, তাহার উপর আছে নির্ম্মল রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিপাত। এককথায় বলিতে গেলে, তাঁহার ভাষা মাধুর্য্যমণ্ডিত। বঙ্কিম-চন্দ্র যে বলিয়াছেন—"পালামৌ শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ"—তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ। সঞ্জীবচন্দ্রের মত গভীর রসবোধ আমরা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মধ্যে পাইয়াছি কি না সন্দেহ। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ভাষায় তত অভিনবত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু ভাবের ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভাষার উপর অপূর্ব্ব রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়াছে। পা লা মৌ প্রবন্ধই সঞ্জীবচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,[১] "যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত; ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া—এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে: তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষার দুইটি ছোট উদাহরণ দিতেছি। বেশী অংশ উদ্ধৃত

---

১। জীবনস্মৃতি, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ সাল, পৃঃ ২৪৫।

করা বাহুল্য, কেন না সম্ভবতঃ সকলেই তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত। কেহ যদি না থাকেন তবে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

তিনি প্রতাপচাঁদই হউন, আর জাল-রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি। [ জাল প্রতাপচাঁদ ]।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল; আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। [ পালামৌ ]।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যাঁহারা নিজের পথে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি চ ন্দ্র না থ, কৃ ষ্ণা, ম ধু যা মি নী ইত্যাদি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার চ ন্দ্র না থ উপন্যাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "স্থানে স্থানে সুমধুর ও স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট"।[১]

ইনি সাধুভাষার রচনার মধ্যে চলিতভাষাও মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার লেখায় বঙ্কিমের প্রভাব যে নিতান্তই অল্প তাহা বলা চলে না। ছোট ছোট বাক্যপরম্পরা বঙ্কিমের লেখার আদর্শেই গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ সে কা ল আ র এ কা ল ইংরেজী ১৮৭৯ কি ১৮৮০ সালের দিকে রচিত হয়। শুধু বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া নহে, ভাবের দিক দিয়াও এই রচনাটি পরম উপভোগ্য। সাধুভাষার ক্রিয়াপদের সহিত মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, সংস্কৃত রীতির সহিত বাংলা রীতি ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িতে কোথাও বাধে না। কিছু উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

---

১। বঙ্গদর্শন, ১২৮১ সাল।

গুরুমহাশয়ের পর আখনজীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আখনজী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদরা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকর-দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আখনজীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগরেদদিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের একজন প্রধান সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। ইঁহার রচনা সরল, সবল এবং প্রাঞ্জল। বঙ্কিমী রীতিকে ইনি কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে বোধগম্য হইবে।

চুড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চুড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি শশী। ছন্দ ত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য জগতে।

সরস ও কৌতুক রচনায়ও অক্ষয়চন্দ্র দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সরসতা (humour) যে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কষ্ট-কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অক্ষয়চন্দ্রের সরল রচনায় ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্র পরস্পরের অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাও সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমী পদ্ধতির অনুযায়ী। তবে ইঁহার লেখার মধ্যে একটা ব্যঙ্গের সুর কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও বা প্রকট ভাবে চলিয়াছে। ভাষাও ঠিক এই সুরের উপযোগী এই কারণে ইন্দ্রনাথের ভাষা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। আর এই হিসাবে ইন্দ্রনাথের রস-রচনা অক্ষয়চন্দ্রের এই জাতীয় রচনা হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রনাথের ক ল্প ত রু নামক উপন্যাস বা ব্যঙ্গ-চিত্র ১২৮১ সালের দিকে প্রকাশিত হয়। ঐ সালের ব ঙ্গ দ র্শ নে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটির প্রশংসা

করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার এই উপন্যাসে কোন কোন চরিত্রের মুখে বীরভূমের কথ্যভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নাটকে এই প্রয়োগ বরাবর প্রচলিত থাকিলেও উপন্যাসের মধ্যে রসসঞ্চার করিবার জন্য বিশুদ্ধ উপভাষার প্রয়োগ বোধ হয় এই প্রথম।

তাঁহার প্রথম রচনাতেই ইন্দ্রনাথ নিজস্ব রীতি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন এবং গোড়া হইতেই ইহাতে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টীকৃত হইবে।

উভয়ে নীরব, কিন্তু বাক্যবিষয়ে কৃপণতা মনুষ্যমাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত মানুষের। অতএব গবেশ কিছুক্ষণ পরে একটা পান চাহিয়া শান্তিভঙ্গ করিলেন। মধুসূদন ভাবিবার বিষয় পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। গবেশ যাইতে স্বীকার না করাতে তাঁহার চিত্ত আলকাৎরার ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল ; সেই গবেশ আবার পান চাহিল, ইহাতে তাঁহার মনে যেন ঝাড়ের আলো হইল। "পান ? শুধু পান ? কেন জল খাবে না ?" মহাব্যস্তে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। গবেশ বাধিত হইলেন। "খেলেই হ'ল" বলিয়া মধুসূদনকে অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কতজন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, গত লোক-সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে ? না থাকিলে থাকা উচিত। [ কল্পতরু ]।

উপমাদির প্রয়োগেও ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। যেমন—

বৃষ্টি ধরিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পরিষ্কৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ার বোধ হয় বিধাতা পুরুষের গুড়ুক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন ?

ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ব্যঙ্গ-চিত্র ক্ষু দি রা মে তাঁহার ব্যঙ্গমিশ্রিত রচনা-ভঙ্গি আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভাষা সরল সাধুভাষা। মধ্যে মধ্যে 'খুঁটিয়ে', 'চেয়ে' ইত্যাদি কথ্যভাষার রূপ আছে। ইহাতে রচনায় কোন দোষ আসে নাই। বঙ্কিমী রীতি ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। ক্ষু দি রা ম হইতে নমুনা হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাড়ীর জন্মপত্রিকা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সে আমোলের লোকও কেহ জীবিত নাই, সুতরাং সে বাড়ীর বয়স বলা অসম্ভব। ঈষৎ ঢেউ খেলান গোছের ছাত এবং স্থানে স্থানে

বা'লি চূণ খসিয়া পড়াতে ভিতর দিকের সেই খোলস-ছাড়া-ভাব দেখিয়া কেহ যদি বয়সের অনুমান করিতে পারেন, করুন, আমি তাহাতে অস্বীকারও করিব না, স্বীকারও করিব না। [ ক্ষুদিরাম ]।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ব র্ণ ল তা ১২৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালে জ্ঞা না ঙ্কু র পত্রিকায় ইহা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, "শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত' এই মাত্র লেখা ছিল'। স্ব র্ণ ল তা-র বিষয়-বস্তুর বা উপন্যাস হিসাবে ইহার দোষ গুণ বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, খাস বঙ্কিমের যুগে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া খাঁটী বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইহা দুঃখের বিষয় যে বইটি প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথোচিত সমাদর করেন নাই। তথাপি স্ব র্ণ ল তা পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হইয়াছিল। এখনও ইহার আদর কমে নাই।

ভাষা হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে স্ব র্ণ ল তা-র ভাষা বঙ্কিমের ভাষা হইতে প্রাচীন-প্রকৃতির ( archaic )। প্রকৃত পক্ষে ইহার রচনার মধ্যে দুইটি স্তর পাশাপাশি বিদ্যমান—একটি বঙ্কিমী পদ্ধতির, অপরটি বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির। এই দুই পদ্ধতির রচনার উদাহরণ পরে দিতেছি। 'বল্' ধাতুর অপেক্ষা 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ ইহাতে অনেক বেশী। 'হইবেক', 'আইল (=আসিল)', 'জান্তেম', 'ভাবলাম', 'বলিতেছিলাম', 'বেরুয়ে (=বেরিয়ে)' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর '-রে' প্রত্যয়ের প্রয়োগও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কথোপকথন মৌখিক ভাষায় দেওয়া হইয়াছে, তবে তাহার মধ্যে সাধুভাষার ক্রিয়াপদের মিশ্রণও যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, 'তুমি শুনিলে প্রত্যয় করুবে না'; 'শুন্‌তে পাইত'; ইত্যাদি। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই অল্প। স্ব র্ণ ল তা-র রচনাপদ্ধতির উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্কিমী পদ্ধতি—

বর্দ্ধমান জেলার বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড় মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়। কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটী ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্ব্বণ ফাঁক যাইত না।

বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি—

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পাঠশালায় লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমীদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন ; জমীদারের সরকারে কার্য্যের বেতন নাম মাত্র। বোধ হয় বেতন না থাকিলেও অনেকে জমীদারের সরকারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন না ; ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

তারকনাথের পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির ভাষা আরও মার্জ্জিত। সেগুলির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, অন্যথা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১ সালে বা ন্ধ ব পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাটির যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের রচনা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির অনুযায়ী। বরঞ্চ আরও সংস্কৃতঘেঁষা এই হিসাবে যে, ইহাতে তৎসম শব্দের বড়ই প্রাবল্য। ইঁহার রচনা সর্ব্বত্র বিদ্যাসাগরের মত ছন্দোময় (rhythmic) নহে, এবং ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার নমনীয়তাও প্রায় নাই। তথাপি চিন্তামূলক ও ওজস্বী রচনার বাহন হিসাবে কালীপ্রসন্নের ভাষা যথেষ্ঠ পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে কালীপ্রসন্নের রচনায় কিছু উদাহরণ দিতেছি।

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাব-নিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প

হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্ষ অথবা আনন্দজনিত হাস্যোল্লাস তখন নিবৃত্ত হয় না। [প্রভাতচিন্তা]।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২৮১ সালে—যে বৎসর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা ন্ধ ব পত্রিকা প্রকাশ করেন সেই বৎসরই—আ র্য্য দ র্শ ন পত্রিকা বাহির করেন। কালীপ্রসন্নের মত যোগেন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরপন্থী। কিন্তু ইঁহার ভাষা কালীপ্রসন্নের ভাষা অপেক্ষা আরও ওজস্বী। যোগেন্দ্রনাথের জো সে ফ ম্যা ট্ সি নি ও ন ব্য ই তা লী ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; নমুনা হিসাবে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ তুলিয়া দিলাম।

কিন্তু মানব-জাতির ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস, সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণবিশ্বাস। জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানব মাত্রেই কতক গুলি কর্ত্তব্য নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানব জাতি যে ধর্ম্মের পরিধি, স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়—সে ধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্বপূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকার নিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন কথা নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। কবিত্ব সৌর কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপর পতিত হয় এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐকতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিলাইয়াছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত স্ফুরিত হয়।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার গদ্যভঙ্গির কিছু বিশিষ্টতা ছিল। নিম্নে তাঁহার গদ্যের কিছু নমুনা দিতেছি।

ব্রাউনিঙের বাঙ্গালী পাঠক অনেক আছেন এমত বিবেচনা করি না। শেলি-বায়রণাদির ভাবানুকরণ, আমাদের কোনও কোনও কবি এক আধটুকু করিয়া থাকেন, ব্রাউনিঙের অনুকরণ

বড় একটা কেহ আজও করিয়াছেন বা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টতঃ বোধ হয় না। ব্রাউনিঙের এক-আধ বিন্দু আভা, অতি ক্ষীণ ও অতি অস্পষ্ট আভার অনুকরণ ও অনুবাদ করিতেন একটি বঙ্গীয় বালিকা ;—কুমারী তরু দত্ত। তরু ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন; কিন্তু সে কবিতা শক্তিময়ী। তরুর শক্তি পরিপক্ক হইতে পারে নাই; কেবল প্রস্ফুটিত হইতেছিল ;—তরুণীর জীবনের সহিত হায়, তাহা লীন হইয়া গিয়াছে। তরুর তরুণ জীবনটুকুই যেন একটি আধ-নিদ্রিত আধ-জাগরিত কবিতা,—কবিতাকুঞ্জের যেন একটি অতি সুকোমল, অতি আক্ষেপময় করুণস্বপ্ন। [ কবিবর রবার্ট ব্রাউনিঙ ]।১

• ঊনবিংশ শতকের শেষদিকের লেখকদিগের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বেশ যশ ছিল। তাঁহার লেখার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ইউরোপবাসী বল, আমেরিকাবাসী বল, এ বিষম পথের কথা এ কঠোর সাধনার কথা মনে করিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা কৃপা করুণার জন্য লালায়িত, তাহারা নতজানু হইয়া যোড়হাত করিয়া উর্দ্ধমুখে কাঁদিয়াই আকুল, বলহীন ও কষ্ট সহিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা সর্ব্বদাই মুরুব্বি ও মধ্যস্থের পদতলে লুণ্ঠিত। মানসিক বলহীনতায় তাহারা বালক, আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতায় তাহারা ননীর পুতুল। তাহারা রক্তমাংসের ভাবনা ভাবিয়াই আকুল। তাহাদের আত্মার রক্তমাংসই বেশী, অস্থি বড় কম। তাহারা এখানকার দুই মুহূর্ত্তের জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির, আর সেই দুই মুহূর্ত্তের জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্যই তাহারা পাগল। ক্ষুধায় অন্ন একমুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডুষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে একফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, কেশবিন্যাসে একটি আল্‌পিন কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া ফেলে।২

বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির রচনায় রজনীকান্ত গুপ্ত অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত করিয়া সংস্কৃতঘেঁষা সাধুভাষায় ওরূপ প্রাঞ্জল এবং মনোহর গদ্য খুব কম লোকেই লিখিতে পারিয়াছে। রজনীকান্তের ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কুসুমকোরক ধীরে ধীরে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল। তাহার কমনীয় কান্তি, প্রশান্ত জ্যোতি

---

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ১৮১।

২। ঐ, পৃঃ ৪৭১-৭২।

ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে লাবণ্যময় দেহলতার অপূর্ব্ব বিকাশ, সে বিভ্রমশূন্য সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ছটা যে দেখিত, সেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিত। এইরূপ কোমলতার সহিত ক্রমে অতুল্য তেজস্বিতা ও অসাধারণ দৃঢ়তার সংযোগ ঘটিল। যে কুসুম-কোরক সুমন্দ সমীরে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইয়া প্রকৃতির এই বিচিত্র রাজ্যে কেবল কোমল ভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাহা এখন ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইয়া, সৌন্দর্য্য-গৌরবের সহিত দৃঢ়তায় অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কিশোরী যৌবনসন্ধিতে যেমন লাবণ্যবতী হইলেন, সেইরূপ তেজস্বিনী ও ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিলেন। অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে, সাহসপ্রদর্শনে তাঁহার গৌরব-কাহিনী সমগ্র রাজস্থানে ঘোষিত হইতে লাগিল। রাজপুত তাঁহাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী মহাশক্তি বলিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। [ রাজপুতবালা ]।[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৮৪ সালে ভা র তী পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই হইতেই তাঁহার গদ্য লেখার আরম্ভ। ইনি দার্শনিক বিষয়েই লিখিতেন। ইঁহার রচনায় একটি অনন্যসুলভ বিশিষ্টতা ও নিজস্ব ভঙ্গি আছে। কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব তিনি অতি সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। ভাষা সরল, সরস ও তেজস্বী। সাধুভাষার মধ্যে তদ্ভব শব্দ তিনি অতি সুন্দর ও বেমালুমভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। সংস্কৃত রীতি ও মৌখিক রীতি তাঁহার রচনায় সুন্দররূপে মিশ খাইয়া গিয়াছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

তা ছাড়া—জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক আধজন অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া ওঠে, তখন আর আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অনলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। [ গীতাপাঠের ভূমিকা ]।

---

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৯৭।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্মীকির জয়ের কতক অংশ বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পরবৎসরেই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।[১] বস্তুতঃ ভাবের দিক দিয়া যেমন ভাষার দিক দিয়াও তেমনি বইখানি অপূর্ব্ব। বাল্মীকির জয় প্রকাশিত হইবার পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন।

১২৯০ সালের বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের কাঞ্চনমালা নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৩২২ সালে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের দ্বিতীয় উপন্যাস বেণের মেয়ে প্রথমে নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ১৩২৬ সালে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

হরপ্রসাদও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্য। বঙ্কিমের রীতিকে হরপ্রসাদ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। আর তাঁহার শেষের দিকের রচনায় এই পদ্ধতি তাঁহার নিজস্ব এক বিশিষ্ট ভঙ্গি পাইয়াছিল। কাঞ্চনমালার ভাষা প্রাঞ্জল সাধুভাষা, কখনও কখনও সংস্কৃতঘেঁষা, দুর্ব্বোধ, এবং কখনও প্রাকৃতঘেঁষা, সরল; মধ্যে মধ্যে মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ভাষার গাম্ভীর্য্যহানি করিয়াছে। দুই ধরণের লেখারই উদাহরণ দিতেছি।

সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিল্লিরবরুতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় কচিত্তুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত-বিধৌত সুরভিচর্চ্চিত বদন শাটাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় সমীরণ বহিল। [তৃতীয় পরিচ্ছেদ]।

১। বঙ্গদর্শন, ১২৮৮ সাল।

সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশীলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। [ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ]।

বেণের মেয়ে সম্পূর্ণরূপে হরপ্রসাদের নিজস্ব রীতিতে রচিত। এই রীতির বিশেষত্ব হইতেছে—( ১ ) মৌখিক ভাষার অনুযায়ী ছোট ছোট বাক্যপরম্পরা, ( ২ ) তদ্‌ভব শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, ( ৩ ) লঘু ও গতিশীল বর্ণনা, ( ৪ ) লেখক ও পাঠকের মধ্যে বিশ্রব্ধভাব। এই সকলগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব হইলেও হরপ্রসাদের লেখায় ইহা পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বিষয়-বস্তু অপরিচিত বা কঠিন হইলেও পাঠকের মন কোথাও বাধে না। ইহার উদাহরণ দিতেছি।

এবার ছবি। ছবি আঁকা সেকালের একটা বাতিক ছিল। সবাই ছবি আঁকিত। ছোট লোকে অন্ততঃ ঘরের দেওয়ালে দুটা ময়ূরও আঁকিয়া রাখিত। বেণেদের বাড়ীর দুপাশে দুটা টাকার থলি আঁকা থাকিত। আর তাহার সঙ্গে এক পাশে একটা শাঁখ ও একপাশে একটা পদ্ম আঁকা থাকিত। লোককে বলিয়া দিত, এ বেণের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। যে দুখানি ছবি রাজাকে দেখান হইল, তাহার একখানিতে নারায়ণ অনন্ত শয়নে শুইয়া আছেন। আর একখানিতে দুই শাল গাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটাই শোয়া-মূর্ত্তি। দুইটাই ডানপাশে শুইয়া আছেন; ডান হাতটী গালে। বাঁ হাতটী আজানুলম্বিত, উরুথের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইজন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, একজনই দুইবার আসিল ও দুইটা পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরও আশ্চর্য্য হইলেন। [ বেণের মেয়ে ]।

হরপ্রসাদ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনারীতির গুণে সব প্রবন্ধগুলিই সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। অনেক সময় মনে হয় যেন প্রবন্ধ পড়িতেছি না, মুখের কথা বা বক্তৃতা শুনিতেছি। তবে ছোট ছোট বাক্য ও লঘু বর্ণনাভঙ্গীর দরুন অনেক সময় হরপ্রসাদের প্রবন্ধ জমাট বাঁধিতে পায় নাই, খাপছাড়া খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধের মধ্যে সরসতা অথচ জমাটভাব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখায় যতটা পাওয়া যায় এমন আর কাহারও রচনায় নহে। ইনি খ্রীষ্টীয় ১৮৯০ সালের দিক হইতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে দার্শনিক তত্ত্বকথা, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লেখেন। ইহাঁর রচনা প্রাঞ্জল, মধুর, প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও ওজস্বী। ইহা ছাড়াও এমন একটা গুণ আছে তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। ইহা বোধ হয় বাগ্‌ভঙ্গির আকস্মিকতা ( unexpectedness )। এই বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় রবীন্দ্রনাথের রীতির ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। ভাষা ঈষৎ পুষ্পিত হইলেও রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় বিষয়-বস্তু বা ভাব কখনও ভাষার দ্বারা উচ্ছ্বসিত বা উল্লঙ্ঘিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার বলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর চিরকাল শ্রদ্ধার্হ হইয়া থাকিবেন, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। [ রচনা সংগ্রহ ]।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্য-গুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্ত-নির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত। [ নানা কথা ]।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা ভগিনীদের প্রায় সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও বেশ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ত বিভিন্ন ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যিক হিসাবে নাম নাই। তথাপি ইনি কিরূপ সরল বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে বোধগম্য হইবে।

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে ;—এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা চাই একবার পথে বাহির হইলে সে পথে চলা তেমন কঠিন নহে কিন্তু পথ দেখানই শক্ত।[১]

ইঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। শুধু প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক বলিয়াই যে ইনি সবটুকু প্রশংসার যোগ্য তাহা নহে। ইঁহার রচনাভঙ্গি সত্যসত্যই উৎকৃষ্ট। আজকালকার মহিলা ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের লেখা পড়িলে কিছুতেই বোধ হইবে না যে কোন স্ত্রীলোকের লেখা পড়িতেছি। স্বর্ণকুমারীর লেখা তদ্রূপ নহে। ইঁহার রচনার মধ্যে স্ত্রীহস্তের ছাপ সুস্পষ্ট। ইঁহার প্রথম উপন্যাস দী প নি র্বা ণ ১৮৭৫ সালের দিকে রচিত হয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় প্রায় বিশ বৎসর পরে। ইঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা ছি ন্ন মু কু ল তৃতীয় বর্ষের ভা র তী-তে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাস ভা র তী-তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার শেষের দিকের রচনা হইতে নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তুমি এই রকম ভাবে কথা কচ্ছ, যেন বয়সে তোমাদের দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যিত আর তা নয়—তোমার আর এমন কি বয়স, বাবা! তোমাদের বিয়েটা

১। পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ সাল।

কিছুতেই অশোভন হবে না। তোমার এই অস্বীকারে স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না ; তুমি যে নিজেকে কি রকম খাট ক'রে দেখছ, তাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। তোমার মত স্বামী লাভ কি সৌভাগ্যের বিষয় নয় ;—তাঁরা ত সকলেই তোমার জন্ম হা-প্রত্যাশ করে আছেন। [ মিলন-রাত্রি ]।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে ঔপন্যাসিক হিসাবে দুইজন লেখকের রচনার উল্লেখ করিতে হয়। একজন শিবনাথ শাস্ত্রী, অপর ব্যক্তি শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। স্বল্প কথায় সরল ভাষায় গার্হস্থ্য ছবি ফুটাইয়া তুলিতে শিবনাথ দক্ষ ছিলেন। সরল ও প্রাঞ্জল গদ্যরচনা হিসাবে ইঁহার আ ত্ম চ রি ত উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ইঁহার অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ. হৃদয়গ্রাহী ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। 'রাধে ! রাজনন্দিনি ! গরবিনি ! শ্যামসোহাগিনি !' বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলীশোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিতেন—'রাখালের সনে প্রেম করিস্‌নে রাই !' অমনি চক্ষে জলধারা বহিত। [ যুগান্তর ]।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখার একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ইঁহার ভাষা সাধুভাষা অপেক্ষা মৌখিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। মৌখিক ক্রিয়াপদ এবং তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ ও সমাস প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি ভাষা দুর্ব্বল বা হালকা হইয়া পড়ে নাই। বরঞ্চ ওজঃগুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্বামীজীর দৃপ্ত ভাব ও অদম্য কর্ম্মক্ষমতা যেন তাঁহার ভাষার মধ্য হইতেও ফুটিয়া পড়িতেছে। ইঁহার লেখার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের

একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। [পরিব্রাজক]।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্তু তিনিই বীর যিনি এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী।১

ব ঙ্গ বা সী পত্রের সহিত বাঙ্গালা ভাষার দুইজন বড় লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ইঁহার লেখার আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। অপর লেখকের নাম বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন বলিয়া বোধ হয় না, তবুও ইঁহার দান বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব। এখনও আমরা ইঁহার রচনার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু কালে যে ইনি যথাযোগ্য সম্মান পাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। ইনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের সব চেয়ে বড় পরিচয় এই যে, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত (grotesque) রসের স্রষ্টা। ইঁহার লেখনীতে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, সরস ও নিষ্কণ্টক ব্যঙ্গ এবং রূপক (allegory) একত্র হইয়া রচনার মধ্যে অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। হু তো ম প্যাঁ চা র ন ক্ সা-র সরসতা (humour) স্থূল চরিত্রের বাস্তব বর্ণনায়; ইন্দ্রনাথের সরসতা স্থূল কষাঘাতযুক্ত, রুচিও সর্ব্বত্র অনিন্দনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সরসতা (humour)—যাহা ক ম লা কা ন্তে র দ প্ত র, মু চি রা ম গু ড়ে র জী ব ন চ রি ত ও লো ক-র হ স্যে পাওয়া যায় তাহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ (academical)। ত্রৈলোক্যনাথের সরসতা অনবদ্য; ইহাতে বিদ্রূপ থাকিলেও কষাঘাত নাই। রুচি অনিন্দনীয়; রূপকের সহিত বাস্তবের মিলনে অপূর্ব্ব। ভাষাও তেমনি ভাবের উপযোগী। মৌখিক ভাষায় সরস

১। ভারতী, ১৩০৯ সাল, পৃঃ ৪৯০। একখানি পত্র হইতে।

গল্প বলার ভঙ্গি সাধুভাষায় অপূর্ব্ব ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যরীতি (idiom) ভাষায় রসসঞ্চার ও চরিত্রে বাস্তবতা আনয়ন করিয়াছে। বিশুদ্ধভাবে সাহিত্যের দিক দিয়া সরস চরিত্র (type) সৃষ্টি ইনিই প্রথম করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। এই হিসাবে ও সকল প্রকার সামাজিক এবং নৈতিক ভণ্ডামিকে সরস ব্যঙ্গে ও বিশুদ্ধ কৌতুকে কটাক্ষ করার হিসাবে বর্ত্তমান সময়ের 'পরশুরাম' ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্য, একথা বোধ হয় বলা চলে।

ত্রৈলোক্যনাথের সরস রচনার কতিপয় উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি। ইঁহার লেখা সাধারণের খুব পরিচিত নহে বলিয়া কিছু বেশী করিয়া উদাহরণ দিলাম।

ধর্ম্মদত্ত গিয়া বাবাজিকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্ম্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন—"ধর্ম্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্ব্বোধ হইতেছিস্! শাস্ত্রে আছে 'চাচা আপনা বাঁচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহায়া তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি! পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!" বীরবালা ]।

বাঁশের নলটী তাঁহার বড়ই সাধের জিনিষ ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিষটী ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সে হিজি-বিজি গুলির বড়ই গৌরব করিতেন! বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর—চীন ভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—"চীন দেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটী প্রস্তুত হইয়াছে। নল নির্ম্মাণ কার্য্যে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক,

আমীর যে নলটী কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্ব্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটী ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি ধর্ম্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটী আমীরের মনোমত হইয়াছিল। [ লুল্লু ]।

নয়ন বলিলেন—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না ; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত এখন আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে না। উহার মধ্যে দুই চারিটী মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটী দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন ! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন—"ঠিক্ ! ঠিক্ ! ঠিক্ কথা ! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল কলা যোগায় কে হে বাপু ! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক ! বেচারি গুলি-খোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টী তো বুঝিতে হবে ? উহার মধ্যে দু-একটী বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটী দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটি-গঙ্গা, আর এক রইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।" [ নয়নচাঁদের ব্যবসা ]।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল ভাই ? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে ঘোলা ফেলিয়া, সেই ঘোলাটি চুবিয়া চাট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল ভাই ?"

নয়ন বলিলেন—"হাঁ। এখন পথে এস ! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ন এই চুপ।"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন। [ ঐ ]।

ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুতরসের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবচখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ওদিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ওধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্ব্বনাশ! প্রাচীরের ওধারে, পৃথিবীর ওপারে কোটি কোটি খর্ব্বকায় ভূত! প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা—প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। [ বীরবালা ]।

করুণরসের রচনায়ও ত্রৈলোক্যনাথের দক্ষতা কম ছিল না। তাঁহার ময়না কোথায় নামক উপন্যাসের এখন বিশেষ প্রচার নাই বটে, এককালে ইহার খুব আদর ছিল। করুণরস-প্রধান রচনা হিসাবে বইখানি চমৎকার। হাস্যরসসমন্বিত লঘু করুণরসের রচনা হিসাবে ফোগলা দিগম্বর নামক উপন্যাস বা বড় গল্পটি এবং বাঙ্গাল নিধিরাম নামক ছোট গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই ছোট গল্পটি (Victor Hugo) ভিক্টর হিউগো-র টয়লার্স্ অব্ দি সী (Toilers of the Sea) নামক উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইলেও ত্রৈলোক্যনাথ ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একজন লেখক মধুসূদনের মত নামধাতু চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ দাস—ডি-এন্ দাস নামেই ইনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলেজপাঠ্য ইংরেজী সাহিত্যের টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজের জীবনবৃত্তান্ত পাগলের কথা নামক গ্রন্থে উপন্যাসচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি রচিত হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পরে, ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তখন জীবিত ছিলেন না। বইটির ভাষা সাধারণের নিকট অদ্ভুত

ঠেকে বলিয়াই বোধ হয় পাঠকসমাজে আদৃত হয় নাই। নামধাতুর প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা (experiment) করিয়াছিলেন, ইহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ধন্যবাদার্হ। পুস্তকটির ভাষা যদি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইত, অর্থাৎ মৌখিক ও লৌকিক ক্রিয়াপদের যদৃচ্ছাপ্রয়োগ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত সন্দেহ নাই। পা গ লে র ক থা হইতে নমুনাস্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রকৃতির এই কমনীয় কান্তি আলোচিতে আলোচিতে আমরা গ্রামের ভিতর পৌছিলাম। দূর থেকে অতি অল্প বাড়ী দেখিতে পাইতেছিলাম; ভাবিলাম, এ কি জনশূন্য স্থানে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু গ্রামে প্রবেশিয়া আমার সে ভ্রম দূর হল।

# নবম পরিচ্ছেদ

## রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রী ভঙ্গির সামান্য লক্ষণ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে, জ্ঞা না ঙ্কু র ও প্র তি বি ম্ব নামক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে। প্রবন্ধটির নাম "ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী।" ইহার বিষয়-বস্তু ছিল ঐ কবিতার বই তিনটির সমালোচনা। তখন রবীন্দ্র-নাথের বয়স পনেরো। তাহার পর ভা র তী পত্রিকায়[1] য়ু রো প-যা ত্রী কো ন ব ঙ্গী য় যু ব কে র প ত্র বাহির হইতে থাকে। তাহার পর বৌ ঠা কু রা ণী র হা ট ও কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা ভা র তী-তে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদনন্তর বা ল ক পত্রিকায় (১২৯২ সালে) রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস রা জ র্ষি-র কিয়দংশ প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসর ইহা সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার পর কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য বই বা বড় লেখা বাহির হয় নাই। ১২৯৮ সাল হইতে সা ধ না পত্রিকার যুগ আরম্ভ। তখনই রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভা বাঙ্গালা গদ্যকে অপরূপ এবং বিস্ময়কর রূপ দান করে। তাহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহাতে নানা প্রকার গদ্য-ভঙ্গি বাঙ্গালীকে তৃপ্তি ও বিস্ময় দিয়া আসিতেছে, এবং বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকেও বিচিত্র অলঙ্কারে ও অপরূপ ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত অদম্য, এত স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে তাঁহার হস্ত (বার্দ্ধক্যবশতঃ) ক্লান্ত হইলেও লেখনী এখনও ক্ষান্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী গদ্যরচনার মধ্যে, গদ্য-ভঙ্গির অভিব্যক্তি এবং রস সৃষ্টি ও ভাববৈচিত্র্যের দিক দিয়া দেখিলে, তিন চারিটি

---

১। তৃতীয় বর্ষ, ১৮০১ শক (= ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

বা ততোধিক স্তরবিভাগ পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় রচনা-মালার মধ্যে বাহ্যতঃ অনেক সময় ঐক্য-সূত্র মিলে না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে রচনারীতিগত একাধিক ঐক্য-সূত্র লক্ষ্য করা যায়। এইগুলিকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মূলগত বিশেষত্ব বলিতে হয়। রচনার কালগত ও পর্য্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির মূলগত বিশেষত্বগুলির আলোচনা আবশ্যক। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাহাই করা যাইতেছে। পরবর্ত্তী দুইটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির কালগত ও পর্য্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য মুখ্য গদ্য রচনার ভাষা ও ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিব।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্য রচনা একটুখানি পড়িলেই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য হয় তাঁহার বলিবার অনন্যসাধারণ ভঙ্গি। (এখনকার দিনে, বিশেষতঃ কতকগুলি লেখকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা এতদূর আত্মসাৎ করা হইয়াছে যে, হঠাৎ পড়িলে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। যেমন হাতের লেখায়, তেমনি কবিতায় এবং সেই পরিমাণে গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এখনকার দিনে অ-সুলভ নহে। অবশ্য এটাও ঠিক কথা যে, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রবীন্দ্রী ভঙ্গি একটি বিশেষ স্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আত্মসাৎকৃত রবীন্দ্রী ভঙ্গি এক জিনিষ, আর রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান অনুকরণ আর এক জিনিষ।) আর এই বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়ে অলঙ্কারশালিত্ব অর্থাৎ বাক্যালঙ্কারের সমধিক ব্যবহার। এ-কথা হয়ত অনেকের কাছে নূতন ঠেকিবে যে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অলঙ্কারপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের কাছ ঘেঁষিয়া যাইতে পারেন এমন কেহই নাই। ইহাতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইলে বুঝি ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের দলে পড়িলেন। (বাণভট্টের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরণের লেখার কতকটা সাধর্ম্ম্য

দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘসমাস-প্রিয়তায় নহে!) ইচ্ছা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, বাছিয়া গুছাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাঁহার লেখনীর মুখে আপনিই আসিয়া গিয়াছে, এবং সেই জন্য তাঁহার ভাষা অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া অলঙ্কৃত বা পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। আর একথা ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি, এবং তাঁহার কবিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত ওতপ্রোত। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কবি-সুলভ অলঙ্কারের প্রয়োগ আকস্মিক বা চেষ্টাকৃত ব্যাপার নহে।

শুধু বুদ্ধির উদ্বোধ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, একেবারে মনের অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া হৃদয়ের অজ্ঞাত, সুপ্ত, কোমল অনুভূতিকে জাগাইয়া দেয়—ইহাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির প্রধানতম গুণ। এই বিষয়েই বোধ হয় রবীন্দ্র-নাথের লেখার সহিত অন্যান্য গদ্যলেখকদিগের রচনার প্রবলতম পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিজনোচিত গভীর সহানুভূতি এবং কাব্যসুলভ বাক্যালঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগই ইহার কারণ এবং করণ বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (এখানে গদ্যের ভাষায় বুঝিতে হইবে) প্রধানতঃ উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক, শ্লেষ এবং বিরোধ (antithesis)—এই কয়টি বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগই সব চেয়ে বেশী। অপর দুই চারিটি অলঙ্কারেরও অল্প-স্বল্প প্রয়োগ আছে।

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে আবার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। ইহার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের, সকল পর্য্যায়ের ও সকল স্তরের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। নিম্নে উদাহরণ দিতেছি। (অলঙ্কারগুলির উদাহরণ কিছু বেশি পরিমাণেই দেওয়া যাইতেছে, যেহেতু সকল কালের এবং সকল স্তরের লেখা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া অলঙ্কারগুলির বিচিত্র প্রয়োগ দেখান এই আলোচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক।)

যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত১ সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। [ ভুবন মোহিনী প্রতিভা ]।২

মাঝে মাঝে এক একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।৩

অন্ধকার এক-পা-এক-পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল-ঘেঁষিয়া অতিকাছে আসিয়া দাঁড়াইল! [ ঐ ]।

অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। [ ঘাটের কথা ]।৪

মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে। তাহাদের কালো কালো মুখগুলি জলের উপরে কৃষ্ণকমলের বন করিয়া রাখিয়াছে। [ সরোজিনী প্রয়াণ ]।৫

—বৃষ্টি বিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। [ রাজর্ষি ]।

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝাইয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিয়া হয়ত বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া হয়ত ঝরিয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্য দ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না। [ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।৬

বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল— [ গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ ]।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। [ গল্পগুচ্ছ : প্রায়শ্চিত্ত ]।

১। মূলে 'প্রস্রবন' আছে। ২। জ্ঞানাঙ্কুর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩।

৩। ১৩৩১ সালের সংস্করণ। ৪। ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ৩০৯।

৫। ঐ, পৃঃ ৩৭৩। ৬। ভারতী ও বালক, ১২৯৩ সাল পৃঃ ৭১৪

—এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে—[ গল্পগুচ্ছ : বিচারক ]।

—গুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। [ গল্পগুচ্ছ : ক্ষুধিত-পাষাণ ]।

একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল—[ গল্পগুচ্ছ : ফেল্ ]।

—মনটা সহসা একটা বোঝা হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। [ গল্পগুচ্ছ : একরাত্রি ]।

—তাহাদের রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। [ গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]।

এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল। [ ঐ ]।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যা মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজ কর্ম্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। [ চোখের বালি ]।১

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশুমুখ বিনোদিনীকে সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। [ ঐ ]।

যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদমধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো কোনো প্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া কোনোরূপ উপলক্ষ্য অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন কি, মাঝে মাঝে লঘুকর স্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা যে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না। [ ছেলে ভুলানো ছড়া ]।

নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্দ্ধামাত্র। [ নৌকাডুবি ]।২

আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধ্যা তাহার জগদ্ব্যাপী বৃহৎ অবসান-বেদনার নিস্তব্ধতায় রমেশের সেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন করিয়া এই স্তব্ধকুলায় আম্রবনে, ঐ তৃণশূন্য বালুতটে, এই

---

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল।

২। বঙ্গদর্শন, ১৩১০ সাল।

তরঙ্গরেখাবিহীন বিপুল জলরাশির উপরে একাকিনী অবগুণ্ঠিতমুখে ক্ষীণজ্যোৎস্ন আকাশতলে দাঁড়াইয়া আছে। [ নৌকাডুবি ]।১

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। [ স্বদেশী সমাজ ]।২

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। [ গোরা ]।৩

পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধ ভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। [ জীবনস্মৃতি ]।৪

এই সকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিষগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙ্গীন করিয়া তুলিত। [ জীবনস্মৃতি ]।৫

উৎপ্রেক্ষার সহিত উপমা ও রূপকের মিশ্রণও রবীন্দ্রনাথের লেখায় যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন—

কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে যখন যশঃ-সূর্য্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনো সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়াছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য্য অস্তোন্মুখ হইল তখনো সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। [ গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]।

এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন দূর দেশের কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল্ করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃতচ্ছায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। [ ঐ ]।

—অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জ্জন, কেবল দুইধারে বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে। [ জীবনস্মৃতি ]।৬

জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন বানিয়ে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে। [ ঘরে বাইরে ]।৭

---

১। ঐ পৃঃ ৪৬৩। ২। বঙ্গদর্শন, ১৩১১ সাল, পৃঃ ২৩৯।

৩। তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮। ৪। প্রবাসী, ১৩১৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।

৫। ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২। ৬। ঐ, পৃঃ ৪১৮।

৭। সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ১৪৩।

তাঁ'কে না-দেখ্‌তে-পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মত আমাদিগকে এদিক ওদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল ! [ চতুরঙ্গ ]।

আজ মেঘলা দিনের সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরচে। [ লিপিকা : মেঘলা দিনে ]।

সৌভাগ্যের দৌড় সুরু হলো ; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়্‌লো। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ব্যাবসা হু-হু ক'রে এগ'লো গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্যোগ-পর্ব্ব থেকে স্বর্গারোহণে। [ যোগাযোগ ]।

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করেচে রাহুর মতো। [ ঐ ]।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটা বিশেষ প্রয়োগ (idiom) এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রয়োগ আর কিছুই নয়, কেবল ভাববাচক বিশেষ্যের ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার এবং তদনুযায়ী বিশেষণ অথবা বিশিষ্ট প্রত্যয়াদির প্রয়োগ। এই উৎপ্রেক্ষা-মূলক বিশিষ্ট-প্রয়োগের (idiom) সহিত অনেকাংশে ইংরেজী অলঙ্কার **Hypallage** বা **Transferred Epithet**-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য বা মিল আছে। এই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রয়োগের অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার ধাতুতে বাধে নাই—কিন্তু এখানে বিশ্ববিজয়ী ইংরেজী ভাষার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

বিজন মহত্ত্ব, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য, সুমধুর চাঞ্চল্য, বেদনাপূর্ণ বিদারণ রেখা, নীরব উপেক্ষা, শঙ্কিত কৌতূহল, উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য, শব্দহীন দীপ্ত সমারোহ, নির্জ্জন দারিদ্র্য, কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা, উদ্ধত পৌরুষ, উন্মত্ত সন্দেহ, চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ, অন্ধ ভয়, অন্ধ ইচ্ছা, গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ; ক্ষমাহীন চিরস্মিদায়ের নীরব ক্রোধানল, উৎপাতহীন শূন্যতা, অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস, অপরাধগুলা নির্জ্জীব এবং সরল, একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ, একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতা, নির্লিপ্ত সুদূরতা, বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী, সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে, সঙ্কীর্ণ নীরসতা, নির্লজ্জ আয়োজন, খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত

প্রদোষান্ধকার, নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা, কাতর সঙ্কোচ, চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধআলস্য, প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণাম, নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতা, নির্ব্বাক নিরীহতা, তারাখচিত অন্ধকার, অশ্রুসিক্ত ভালবাসা, অপক্ষপাত দ্রুততা, অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌন, অশ্রুপূর্ণ অভিমান, আত্মবিস্মৃত কলরব, নীরব একাগ্রতার ভাষা, অশ্রুহীন কাতরতা, দরিদ্র আয়োজন, নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায়, সন্দেহের ক্ষুদ্রতা, নিবিড় সামাজিকতা, উদ্ধত অবিনয়, সাড়ম্বর কৃত্রিমতা, সোনালি রঙের মাদকতা, সোজা লাইনের তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা, গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তি, উদার বীর্য্যবান সহিষ্ণুতা, জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়, একটা কালো ক্ষুধা, কঠোর অবাধ্যতার ইসারা, কোথাকার কোন ঔদাসীন্য, জীবনটা বিবর্ণ বিরস এবং চির অভুক্ত, কৌতূহলী কল্পনা, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, বোবা অন্ধকার, পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাত, বোবা একটা ব্যথা, বোবা গভীরতা, কাঁচা সংকোচ; বৃদ্ধ অশুচিতা; ইত্যাদি।

এখন প্রকৃত **Hypallage** বা **Transferred Epithet**-এর কিছু উদাহরণ দিতেছি। এইরূপ প্রয়োগও সুপ্রচুর আছে।

ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি, বিরাট বিরহীবক্ষ, বিজন বিনিদ্র শয্যা, ইংরাজ-ঘরের চা'য়ের চুমুক, ঋষির করুণার্দ্র কবিত্ব, কর্ম্মহীন শরৎমধ্যাহ্ন; ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা-মূলক এই প্রয়োগের সহিত সম্পর্কযুক্ত আর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে দেখা যায়। সেটি হইতেছে বস্তু-বাচক বিশেষ্য অথবা বিশেষণের পরিবর্ত্তে ভাব-বাচক বিশেষ্যের প্রয়োগ (**use of the abstract for the concrete or for a qualitative adjective**)। যেমন,—

অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না।

তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না।

শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অসমত্ব হইতে ছুটি লইয়া কোন একটা নিভৃত জায়গায় আরামে স্থায়ী হইয়া বসিবার জন্য তাহার সমস্ত শরীর মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহাই হউক ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে।

উৎপ্রেক্ষার পরই উপমা এবং রূপকের বাহুল্য লক্ষিত হয়। পর পর উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উপমারও নানা রকম ভেদ—যেমন শ্লিষ্ট উপমা, প্রতিবস্তূপমা, মালোপমা, ইত্যাদি। এ সকলও রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় দুর্ল্লভ নহে। এই সকলের উদাহরণও নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির ভিতর মিলিবে।

রবীন্দ্রনাথের উপমা ও রূপক প্রায়ই উৎপ্রেক্ষার সহিত মিশ্রিত থাকে। উপমার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। [ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।১

নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত ; বহুদূর পর্য্যন্ত তার প্রসার নহে ; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায় ; [ গল্পগুচ্ছ : সুভা ]।

সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপাঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জাইস্ অক্ষরের ছোট বড় নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। [ গল্পগুচ্ছ : মুক্তির উপায় ]।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। [ গল্পগুচ্ছ : মানভঞ্জন ]।

শাবকহীন মুরগী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। [ গল্পগুচ্ছ : প্রতিবেশিনী ]।

---

১। ভারতী ও বালক, ১২৯৩ সাল, পৃঃ ৭১৭।

কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মত নূতন চাল চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। [ গ্রাম্য সাহিত্য ]।

কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় শুশুভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছিল। [ চোখের বালি ]।

বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। [ গোরা ]।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। [ ঐ ]।

—কুসুম-সুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—[ ঐ ]।

দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মত, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত। [ জীবনস্মৃতি ]।

প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। [ জীবনস্মৃতি ]।

তখনো দেখিলাম, মুখে সেই জ্যোতি—যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে। [ চতুরঙ্গ ]।

সমুদ্রের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ-প্রণামের মত নত হইয়া পড়িল। [ ঐ ]।

—ও কোন্ ঘরের বউ গা! যেন নির্ম্মাল্যের ফুল। [ লিপিকা : সুয়োরাণীর সাধ ]।

রূপকের ব্যবহার উপমার তুলনায় বিশেষ কম নহে এবং ইহাও অধিকাংশ স্থলেই উৎপ্রেক্ষা মিশ্রিত। প্রায়ই সমানাধিকরণ সম্বন্ধ পদ ( appostional genitive )-এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ রূপকের প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপকের উদাহরণ—

—এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টে পৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। [ ভুবন মোহিনী প্রতিভা ]।

—তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। [ গল্পগুচ্ছ : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ]।

—হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া—[ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

—লোকালয়ের নয়নপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায়? [ গ্রাম্যসাহিত্য ]।

অকালবসন্তে রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদন-দাহনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন,—অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্য্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাহীন। [ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ]।১

—তাহা সাধ্বী-নারী-হৃদয়ের অতিনিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্ম্মল প্রেমের সঙ্গীত। [ চোখের বালি ]।

সেই ভাবগভীর মুখ, সেই নির্ম্মল ললাটের উপর জলভারনম্র নবনীরদের মত স্তম্ভিত কেশরাজি, সেই সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তনুদেহে কোমল শাড়ীটির তরঙ্গিত অঞ্চলরেখা, সেই স্নিগ্ধবিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা আজ সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার সুদূরতা হইয়া তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভৃত-নিস্তব্ধ বিশ্রাম হইয়া, জনশূন্য বালুতটের দিগন্তবিস্তারিত পাণ্ডুরতা হইয়া, বিশাল প্রকৃতির মূক-বৃহৎ অব্যক্তভাষায় জলে-স্থলে-আকাশে,—চন্দ্রের অস্ফুটআলোকে ও বনের প্রগাঢ়চ্ছায়ায়,—নদীর স্তিমিত-গোপন গতিতে ও তটভূমির তিমিরাচ্ছন্ন গম্ভীর নিশ্চলতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল—[ নৌকাডুবি ]।২

—নানাবিধ চৈতালি ফসলের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। [ জীবনস্মৃতি ]।

সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। [ ঘরে বাইরে ]।৩

—অসাড়তার একটা পাৎলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল—[ চতুরঙ্গ : শচীশ ]।

—আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্ত্তটার মধ্যে পড়িল। [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। [ নামঞ্জুর গল্প ]।৪

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪২৫। ২। বঙ্গদর্শন, ১৩১০ সাল, পৃঃ ৪৬৩। ৩। সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৩১১। ৪। প্রবাসী, ১৩৩২ সাল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

শতকরা ন'টাকা হারে সুদের ন'পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চারদিকে জাল জড়িয়ে চ'লেচে। [ যোগাযোগ ]।

আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে। [ শেষের কবিতা ]।[১]

উপমার ভঙ্গি ( এবং কতক অংশে উৎপ্রেক্ষারও ) বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। কালিদাসের পর এক বাণভট্ট ছাড়া আর কোন কবি উপমার এইরূপ মৌলিকতা ও প্রাচুর্য্য দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অল্প দুই একটি উপমার ভাব রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে লইয়াছেন। যেমন—

লাবণ্যলেখা পশ্চিমদেশের নবনীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জননদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মত হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল। [ গল্পগুচ্ছ : রাজটীকা ]।

( ইহার সহিত তুলনা করা যায় কুমারসম্ভবের এই শ্লোক—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
নির্বৃত্তপর্জ্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ [ ৭।১১ ] ॥ )

ব্যর্থ বেশবিন্যাসের আক্ষেপ বহন করিয়া একটি মৃদু সুগন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। [ নৌকাডুবি ]।

( এই বাক্যটি কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের ৭৫ সংখ্যক শ্লোকটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। )

ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। [ নৌকাডুবি ]।

( ইহার সহিত তুলনীয়—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ [ কুমারসম্ভব ৩।৪১ ] ॥ )

তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। [ গল্পসপ্তক : হৈমন্তী ]।

১। প্রবাসী, ১৩৩২ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬।

( ইহার মূল মেঘদূতের এই শ্লোকার্দ্ধ—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং

রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ )

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ ইংরেজী হইতেই পাইয়াছিলেন। উপমার ভাব ইংরেজী হইতেও কিছু কিছু লইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই তিনি বেমালুমভাবে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, বিদেশী ভঙ্গি বলিয়া একটুকুও বুঝিবার যো নাই। তবে অল্প দুই এক স্থলে একটু বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ অনবধানতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইংরেজী হইতে গৃহীত বিসদৃশ উপমা ও উৎপ্রেক্ষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতীর মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মত পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। [ গল্পগুচ্ছ : উদ্ধার ]।

লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। [ গল্পগুচ্ছ : একরাত্রি ]।

—কোনো একটা বাড়ীর দিকে চাহিয়া কখনো এ-কথা মনে হয় না যে, হয়ত এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে সয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে ! [ গল্পগুচ্ছ : ডিটেক্‌টিভ্‌ ]।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। [ চোখের বালি ]।

আশার ঘোমটার মধ্যে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। [ ঐ ]।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [ ঐ ]।

—এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। [ গোরা ]।

—সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। [ গল্পসপ্তক : হৈমন্তী ]।

উৎপ্রেক্ষা ও উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রিয় অলঙ্কারবিষয়-বস্তু আছে। এই অলঙ্কারবিষয়-বস্তুগুলি তিনি একাধিক স্থলে—প্রত্যেক্ বারেই অবশ্য কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিতভাবে—ব্যবহার করিয়াছেন। সকল কবিরই এই রকম থাকে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

[ ১ ] 'দরখাস্ত-নালিশ' সম্বন্ধীয়—

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। [ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি ? [ স্বদেশী সমাজ ]।

—যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে। [ চতুরঙ্গ ঃ শ্রীবিলাস ]।

[ ২ ] 'কালী-বই' সম্বন্ধীয়—

তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ জীবিত ও মৃত ]।

বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল। [ চোখের বালি ]।

[ ৩ ] 'দিবা-দ্বিপ্রহর' সম্বন্ধীয়—

সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। [ গল্পগুচ্ছ ঃ সুভা ]।

—তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক। [ গল্পগুচ্ছ ঃ মহামায়া ]।

—তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [ গল্প চারিটি ঃ দর্পহরণ ]।

[ ৪ ] 'বেদনা' সম্পর্কীয়—

—যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ পোষ্টমাষ্টার ]।

তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ শাস্তি ]।

এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল—[ গল্পগুচ্ছ ঃ অধ্যাপক ]।

জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে। [ গ্রাম্য সাহিত্য ]।

[ ৫ ] 'মদ্য' সম্পর্কীয়—

—যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণ্যমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া—[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

ক্ষমতামদ মদিরার মত তাঁহার শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। [ রাজর্ষি ]।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [ চোখের বালি ]।

দুচার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মত মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। [ ঐ ]।

এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। [ জীবনস্মৃতি ]।

হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। [ চতুরঙ্গ : দামিনী ]।

উঠে দেখি গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। [ লিপিকা : বাণী ]।

[ ৬ ] 'শিশু' বিষয়ক—

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মত উর্দ্ধমুখে শয়ান রহিয়াছে। [ নৌকাডুবি ]।

একদিকের গৃহশ্রেণী সহাস্য নিদ্রিত গৌরতনু উলঙ্গ শিশুদের মত ধব্ ধব্ করিতেছে। [ ঐ ]।

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। [ গোরা ]।

[ ৭ ] 'নদী-সরোবর' সম্বন্ধীয়—

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখিনি। মনে হল, নদী যেন চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে থম্‌কে সরোবর হয়েচে। [ লিপিকা : বাণী ]।

—ঝরণা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হ'য়ে দাঁড়ায়। [ শেষের কবিতা ]।

[ ৮ ] 'যবনিকা' সম্বন্ধীয়—

যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। [ গল্পগুচ্ছ : শুভদৃষ্টি ]।

—তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। [ গোরা ]।

পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল। [ জীবনস্মৃতি ]।

[ ৯ ] 'পক্ষী-ডিম' সম্বন্ধীয়—

মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা' দিতেছে। [ সরোজিনী প্রয়াণ ]।

—হয়ত এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে। [ গল্পগুচ্ছ : ডিটেক্‌টিভ্ ]।

পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া শাদা কুয়াশা ডিম্বগুলির উপর নিস্তব্ধ-আসীন রাজহংসের মত স্থির হইয়াছিল। [ নৌকাডুবি ]।

[ ১০ ] 'সঙ্গীত-সুর' সম্বন্ধীয়—

এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। [ জীবনস্মৃতি ]।

সে যেন এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। [ লিপিকা : সিদ্ধি ]।

[ ১১ ] 'কল-ইষ্টিম' সম্বন্ধীয়—

সেদিন বাংলা দেশের সময়ের কলে পুরো ইষ্টিম দেওয়া হয়েছিল। [ ঘরে বাইরে ]।

সবাই বল্‌লে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মের ইষ্টিমেতেই এ-জন্মের গাড়ি চ'ল্‌চে। [ যোগাযোগ ]।

[ ১২ ] 'পদক্ষেপ' সম্বন্ধীয়—

—যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—[ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্দ্ধামাত্র। [ নৌকাডুবি ]।

এই রকম আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমি কিছু করিয়া দিলাম।

রূপকের পরই শ্লেষালঙ্কারের নাম করিতে হয়। শ্লেষ রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাণভট্টের তুলনার কথা মনে আসে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরসতার ( humour ) খাতিরে রবীন্দ্রনাথ শ্লেষের প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্লিষ্ট উপমাদির উদাহরণ কিছু কিছু পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন বিশুদ্ধ শ্লেষের কিছু উদাহরণ দিলাম।

—ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, মুগ্ধবোধের সূত্র টুক্‌রা টুক্‌রা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত। [ বাংলা ব্যাকরণ ]।১

তখনো ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। [ জীবনস্মৃতি ]।

প্রেমের বৈকুণ্ঠালোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া ? [ গল্পসপ্তক : হালদার গোষ্ঠী ]।

তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল। [ গল্পসপ্তক :

মানুষের যোগ যদি সংযোগ হয় ত ভালই, নইলে সে দুর্য্যোগ। [ শিক্ষার মিলন ]।২

অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে—[ নামঞ্জুর গল্প ]।

ইংরেজী ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হলো বৃদ্ধি। [ শেষের কবিতা ]।

অন্যান্য অর্থালঙ্কারের মধ্যে Synecdoche, Metonymy, Epigram, Oxymoron, ( বিরোধাভাস ) Zeugma ( দীপক ) Litotes, আক্ষেপ ইত্যাদির প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

---

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪৫১।

২। প্রবাসী, ১৩২৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৪।

**Synecdoche—**

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। ফুল-বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক্ হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। [ রাজর্ষি ]।

—অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটীরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়। [ গল্পগুচ্ছ ঃ সমস্যাপূরণ ]।

—বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে—[ গল্পগুচ্ছ ঃ সমাপ্তি ]।

—এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। [ নামঞ্জুর গল্প ]।

**Metonymy—**

এ ত সে মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ শুভদৃষ্টি ]।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [ চোখের বালি ]।

—সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া—[ ঘরে বাইরে ]।[১]

**Epigram—**

নব্যসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাব-সিদ্ধ বিধাতা-দত্ত সুমহৎ বর্ব্বরতা হারাইয়া—[ গল্পগুচ্ছ ঃ মণিহারা ]।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। [ চতুরঙ্গ ঃ শ্রীবিলাস ]।

—তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। [ গল্পসপ্তক ঃ হালদারগোষ্ঠী ]।

—মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। [ গল্পসপ্তক ঃ হৈমন্তী ]।

লাভ করিবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। [ ঘরে বাইরে ]।

১। সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ২৮৮।

তাজমহলকে ভাললাগাবার জন্যই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার। [ শেষের কবিতা ]।

Oxymoron—

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার রকম সকম দেখিয়া—[ গল্পগুচ্ছ : একটা আষাঢ়ে গল্প ]।

যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া—[ গল্পগুচ্ছ : ক্ষুধিত পাষাণ ]।

কোন্ দূরদেশের কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত—[ জীবনস্মৃতি ]।

Zeugma ( দীপক ) –

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল—[ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

—মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ। [ বাংলা জাতীয় সাহিত্য ]।[১]

আক্ষেপ ( তুলনীয় Litotes )—

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইত, কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গেও দেখা হইয়া পড়িত—সেরূপস্থলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অত্যন্ত হতাশ হইত না। [ নৌকাডুবি ]।

শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন একথা যদি কোন পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই। [ জীবনস্মৃতি ]।

কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয় ছুটিয়াও নয় একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল। [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

Antithesis ( আবৃত্তি )—এই অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষার একটা প্রধান বিশেষত্ব একথা বলা চলে। প্রথমদিককার রচনা অপেক্ষা শেষদিককার রচনাই এই ভঙ্গি বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

---

১। সাধনা, ১৩০১-০২ সাল, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৬১।

উদাহরণ—

বড় বড় ব্যাপার বিপর্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু এটুকু থাকে! বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু চায়ের নেশা বরাবর টি'কে; চোখে চোখে যে ছিল, সে চিরদিনের মত অন্তরালে পড়িয়া যায়, কিন্তু ধূমপানের হু'কাটি কোনদিন কাছছাড়া হয় না—[ নৌকাডুবি ]।

দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতর লুকানো। [ ঐ ]।

হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল। [ গল্প চারিটি : পণরক্ষা ]।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। [ জীবনস্মৃতি ]।

ইহার মধ্যে তথ্য খু'জিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খু'জিলে পাওয়া যাইবে। [ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ]।১

তাদের কণ্ঠে সুরের আভাস মাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সেকথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। [ শিক্ষার মিলন ]।

দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চ। [ ঘরে-বাইরে ]। ২

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থাম্‌ল। [ লিপিকা : রাজপুত্ত্র ]।

Climax-এর উদাহরণ—

—অন্ধ, অন্ধতর, অন্ধতম রজনীর মধ্যে—[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

Anticlimax-এর উদাহরণ—

চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত অথবা অর্থান্তরন্যাস দ্বারা কিংবা উপমা রূপকাদি অলঙ্কারের পুনরুক্তি দ্বারা উক্ত বিষয়ের সমর্থন বা ব্যাখ্যা করা। এই হিসাবে রবীন্দ্রী রীতিকে

১। প্রবাসী, ১৩১৯ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২। সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ২৯০।

**explanatory style** বা ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই পদ্ধতির যেমন অনেক গুণ আছে, তেমনি দোষও কিছু কিছু আছে। অনেক ভালো ভালো উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ ব্যাখ্যা বা সমর্থনের জন্য খেলো বা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রকৃত **paradox** মিলে না। ব্যাখ্যা করিয়া দিলে **paradox**-এর বিশেষত্ব থাকে না। নিম্নের উদাহরণটিতে এই কারণেই **paradox** বা বিরোধাভাস জমিয়া উঠিতে পারে নাই।

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালায় ছাদের সঙ্কীর্ণ কার্ণিসটার উপর দিয়ে চলে' যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে' মনে করতুম। ভয় করত না বলে' নয়, ভয় করত বলে'ই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত ব'লেই তা'কে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে' মনে হ'ত। [ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ]।১

প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্যাস এবং অন্যান্য অলঙ্কারের প্রয়োগের দ্বারা ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শাণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই অন্তর্দ্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে। [ রাজর্ষি ]।

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। সকল বড় কা... আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, আর একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যার ঘরে লইয়া যায়। একেবারে তানের মধ্যে আকাশ পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়। [ মেঘদূত ]।২

এখানে প্রথম বাক্যের উক্তিটি পরবর্ত্তী চারিটি বাক্যে চারিটি বিভিন্ন উক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত বা সমর্থিত হইয়াছে।

১। প্রবাসী, পৌষ ১৩৩১ সাল, পৃঃ ২৯৪।

২। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ১৭৭।

শকুন্তলার এত দুঃখকে নিস্ফল করিয়া শূন্যে তুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কি দশা ঘটে? [ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ]।[১]

পূর্ব্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেল। যে লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম। [ জীবনস্মৃতি ]।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয় ত বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। [ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ]।

দরকারের অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা। [ শিক্ষার মিলন ]।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় humour বা সরসতার প্রধান উপকরণ হইতেছে iunuendo, irony এবং sarcasm বা ব্যাজস্তুতি। শ্লেষের এবং অন্যান্য অলঙ্কারেরও এই প্রয়োজনে ব্যবহার হইয়াছে। এই জন্যই রবীন্দ্র-নাথের সরসতা অনেকটা academical বা বুদ্ধিগ্রাহ্য। যেমন—

পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩,৩৭৫৲ টাকা খাজানা দিয়া থাকে। [ গল্পগুচ্ছ: যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ]।

কলিকাতার এ বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরীর ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। [ গল্পগুচ্ছ: সুভা ]।

—তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্‌পরা ফুলমোজা মণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেন্ট্‌" "এক্সেলেন্ট্‌" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। [ গল্পগুচ্ছ: মানভঞ্জন ]।

---

১। ঐ, পৃঃ ৪৩৩।

তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক তার পর বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। [ গল্পগুচ্ছ : অনধিকার প্রবেশ ]।

—সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাললঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে। [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

শুনিয়া বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এ-রকম ঠাট্টা ভালো নয়। [ গল্পচারিটি : দর্পহরণ ]।

কর্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন—পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভব মাত্র করেন না। [ গোরা ]।

অনুপ্রাস ঘটিত সরসতার একটি উদাহরণ দিতেছি—

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্য কুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারী বাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীন ভারত-সাবধান ! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি ! অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে, তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অথবা, বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উন্মত্ত লেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলায় দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গাল্‌ভ্যালিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা ! [ প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ][১]

সাধারণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য বা academical হইলেও সরসতার ঔজ্জ্বল্য পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দেয়। যেমন—

এইত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি ! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে। [ গল্পগুচ্ছ : মুক্তির উপায় ]।

বস্তুত ফলাফলের বিচার ভার কবির উপর নাই। কবি বলিতেছেন, যখন,

"শরদচন্দ্র, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ,"

তখন বনের মধ্যে রাধিকাকে লইয়া শ্যামচন্দ্রের ভুলিতে ইচ্ছা হইল। চিকিৎসক বলিতে পারেন, ইহার ফল ভাল নয়—শরৎ কালের হিমে নিশ্চয় জ্বর, এবং ইহার আরম্ভে যতই মাধুর্য্য

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৪১৯।

থাকুক্, ইহার পরিণামে কুইনীনের তিক্ততা—কিন্তু সে বিচারে কবিকে ফিরাইতে পারে না। যতক্ষণ আকাশে শরৎচন্দ্র এবং বনে পুষ্পগন্ধ আছে, ততক্ষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় কাব্যের রসভঙ্গ হইবার কথা নাই। [ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ]।১

সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সম্ভার প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। [ জীবনস্মৃতি ]।

আজ পর্য্যন্ত কোন লেখকই রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে অনুপ্রাসের মধুর প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। কলমের মুখে আপনা হইতে আসিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুপ্রাস কোথাও অসঙ্গত বলিয়া কানে ঠেকে না, বরঞ্চ একটা অপূর্ব্ব লালিত্য আনিয়া দেয়। এই অনুপ্রাস অনেক সময় যমকের কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে, তখন ইহা কতক পরিমাণে ইচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয়। শেষের দিকের রচনায় এই যমকঘেঁষা অনুপ্রাস যে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাকৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুপ্রাস প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি।

—সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেলে। [ রাজর্ষি ]।

সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। [ গল্পগুচ্ছ : শুভদৃষ্টি ]।

—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে। [ গল্পগুচ্ছ : মহামায়া ]।

—আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষ কালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া বেড়াইত। [ গল্পগুচ্ছ : দুরাশা ]।

যে স্বামী বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার—[ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

—অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত। [ ঐ ]।

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪২৮।

সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। [ ছেলেভুলানো ছড়া ]।

—মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ। [ বাংলা জাতীয় সাহিত্য ]।

—সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্ব্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে—[ চোখের বালি ]।

তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। [ গোরা ]।

আস্মানে আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশী বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি? [ ঘরে বাইরে ]।

কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। [ গল্প-সপ্তক : হৈমন্তী ]।

সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেন নি। [ নামঞ্জুর গল্প ]।

—এমন বানান বানালে—[ শেষের কবিতা ]।

—পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতে—[ ঐ ]।

—তোমার যত শাণিয়ে বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও। [ ঐ ]।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা বেশী বলা হ'ল। [ শরৎচন্দ্র ]।[১]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় অর্থালঙ্কারের এই যে আলোচনা করা হইল, ইহা হইতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন, যে এই অলঙ্কারশালিতা শুধুই ইচ্ছাকৃত। প্রকৃত পক্ষে ইহার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মচেতনা বা আত্মদৃষ্টি (subjectivity)। পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় লেখক হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের কাছে বাহ্যবস্তু বাহ্যবস্তুই; লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্লিপ্ত রাখিয়া আগ্রহ অথবা অনাগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ অথবা সহযোগিতা করিতেছেন। আর রবীন্দ্র-নাথের নিকট বাহ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতি বা চেতনার

১। প্রবাসী, ১৩৩৮ সাল, প্রথম খণ্ড, ৮০৬।

দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চেতনা বা ব্যাপক অস্তিত্বের অন্তর্গত। সেই কারণেই বাহিরের ঘটনা বা সংস্থান অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনের ব্যাপার বা সংস্থান রবীন্দ্রনাথের নিকট অধিক মূল্যবান। আর বাহিরের ঘটনা বা বস্তু তখনই মূল্যবান হইয়া হইয়া উঠে যখন পাত্র-পাত্রীর ( অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথের ) মনোব্যাপারে তাহাদের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া কাজ করে। সুতরাং এইরূপ subjective বা আত্মদৃষ্টিমূলক রচনাভঙ্গিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ অপরিহার্য্য। এইটাই রবীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

---

## দশম পরিচ্ছেদ

## রবীন্দ্রী ভঙ্গির বিশেষ লক্ষণ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের গন্থ-ভঙ্গির সামান্স-ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি, এখন বিশেষ-ধর্ম্মের আলোচনা কিছু করিব। প্রথমে বাক্য-গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব, তাহার পর পদ ও শব্দ প্রয়োগের রীতি সম্বন্ধে।

দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরা অনেক সময় হ্রস্ব-বাক্য দিয়া শেষ করা হইয়াছে। অনুচ্ছেদের শেষে এইরূপ করাতে বাগ্‌ভঙ্গির আকস্মিকতা হেতু একটু বৈচিত্র্য আসিয়া যায়। যেমন—

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট! যাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্তার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল। [ গল্পগুচ্ছ : সমস্তাপূরণ ]।

কোনো কোনো বাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কর্ত্তৃপদের পুনঃ-প্রয়োগ অনেক সময় করা হয় নাই। এই প্রয়োগ বাঙ্গালার রীতিসিদ্ধ হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় বড় দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। আরও উদাহরণ দিতেছি।

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। [ রাজর্ষি ]।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। [ চোখের বালি ]।

অসংপৃক্ত বাক্য কমি বা ড্যাশ-চিহ্নের দ্বারা অনেক সময় যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাও বৈচিত্র্যের খাতিরে। যেমন—

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল—বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল। [ গল্পসপ্তক : বোষ্টমী ]।

অনির্দ্দেশক (indefinite) সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনামের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখাতেই বেশী দেখা যায়। যেমন—

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিয়া হয় ত বুঝিতে পারিবে—[ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।

বিস্ময়দ্যোতক ( exclamatory) বাক্যের পরিবর্ত্তে বর্ণনাত্মক (assertive) বাক্যের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বাক্যভঙ্গি। যেমন—

আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছেন না। [ গল্পগুচ্ছ : সুভা ]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পরস্পরিত ( correlative ) বাক্যের প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়। আর এই পরস্পরিত বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘ ছাঁদের। সম্বন্ধযুক্ত বাক্য ( relative clause ) এবং হেতুমৎ বাক্য (relative sentence) প্রায়ই মূল বাক্যের শেষে আসে। যেমন—

সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত আকাশব্যাপী, অথচ একটি হরিণশাবকের মত ভীরু। [ গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]।

সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত যেমন ভালবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে ভালবাসে ; যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—যে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়। [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

'কেননা', 'কারণ' প্রভৃতি হেতুবাচক শব্দ দিয়া অনেক সময় স্বাধীন ( independent ) বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। 'যেন' এই উপমা বা উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক শব্দেরও এই রকম প্রয়োগ আছে। যেমন—

বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী। [ জীবনস্মৃতি ]।

'মুস্কিল এই' অথবা 'কিন্তু মুস্কিল এই' বাক্যাংশ দিয়া অনেক সময় বাক্যের আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ইংরেজি '( but ) the dffioulty is' এই বাক্যাংশের প্রয়োগ স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন—

মুস্কিল এই, যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশী বলিবার যো নাই। [ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।

'বোধ করি' এই বাক্যাংশ দিয়া আরম্ভ করিয়া অনেক সময় পর পর একাধিক বাক্যের ব্যবহার করা লইয়াছে। যেমন—

বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল ; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছলতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল ; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিয়াছিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ অতিথি ]।

অসমাপিকার সহিত 'তবু' বা 'তবে' শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটা বিশেষত্ব। যেমন—

কপালকুণ্ডলার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা কর—[ কাব্য। স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ]।

ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। [ ঘরে-বাইরে ]।

তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। [ শিক্ষার মিলন ]।

এই স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার (past participle-এর) স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। '-ইলে' প্রত্যয়ান্তের স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্তের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। সাধুভাষার ব্যাকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা খুব শুদ্ধ প্রয়োগ নহে।

তবে ইহার মূলে যে কথ্যভাষার রীতি আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। উদাহরণ—

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙ্গিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন "প্রহরি"। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

সে ভাবিয়াছিল, কোনক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসরের মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে। [ নৌকাডুবি ]।

—প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে—[ গোরা ]।

সপ্তমীর '-তে' প্রত্যয়ান্ত আকারান্ত ভাববচন (verbal noun)-এর স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। ইহারও মূলে কথ্যভাষার রীতি। উদাহরণ—

দূরের আশা দূর হইয়া১ নিকটের জিনিষগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। [ গল্পগুচ্ছ : শুভদৃষ্টি ]।

—নৌকাডুবি হইয়া১ একটা ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে। [ ঐ : আপদ ]।

কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিয়া২ তাহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। [ চোখের বালি ]।

শীতের শীর্ণগঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়া বাড়ী এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে। [ নৌকাডুবি ]।

আনন্দময়ীর সহিত আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। [ গোরা ]।

—আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে। [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

অতীতকালের ক্রিয়ার সহিত অথবা স্বাধীন ভাবে, অতীত কালের অর্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—প্রায়ই বর্ণনায়—রবীন্দ্রনাথই আধুনিক কালে বেশী করিয়া চালাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই রীতি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার প্রভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন—

১। =হওয়াতে। ২। =করায়, করাতে।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। [ গল্পগুচ্ছ : জীবিত ও মৃত ]।

বর সদলবলে কন্যাকর্ত্তার কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, বড় কষ্ট দিলাম ; বড় কষ্ট দিলাম! [ গল্পগুচ্ছ : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ]।

সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের[১] দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দ্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বারজানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু আধটু চাপা হাসি, ফিস্ ফিস্ কথা, দুটা একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়। [ চোখের বালি ]।

রঙের কাগজ দুখানিই অন্নদাবাবু হাতে রাখিয়াছিলেন, কোন্‌টিতে হাতের-পাঁচ রক্ষা হইবে, খেলা শেষের দিকে আসিবার পূর্ব্বে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। [ নৌকাডুবি ]।

অতীতকালের ক্রিয়াপদের সহিত অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগও কিছু কিছু দেখা যায়। ইহাও কথ্যভাষার প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে। যেমন—

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে। [ গল্পগুচ্ছ : বিচারক ]।

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে অ-ব্যক্তিবাচক কর্ত্তৃপদের ক্রিয়ায় সম্ভ্রমে বা গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন যেমন—

—তখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন—[ রাজর্ষি ]।

—সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। [ আলোচনা ]।[২]

—ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন—[ গোরা ]।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়, এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি অনেক ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগ রীতি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ঢুকিয়া আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্য রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়া

১। মূলে 'চৈত্রর'।

২। সাধনা, ১৩০১-০২ সাল, পৃঃ ৪৮১।

যতটা হইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এইরূপ ইংরেজিয়ানার প্রায় অধিকাংশই এখন আর ধরিবার উপায় নাই। এখনও যাহা একটু আধটু বোঝা যায় তাহাও আর কিছুদিন পরে ধরা মুস্কিল হইবে। অতএব এইখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজিয়ানা সম্বন্ধে কিছু বলিব। অলঙ্কারের মধ্য দিয়া ইংরেজিয়ানার প্রয়োগের বিষয়ে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

গুণবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে ইংরেজী indefinite article-এর মত অনির্দ্দেশক 'একটি' 'একটা' শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। এই প্রয়োগ ইংরেজী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন ইহা বাঙ্গালায় কতকটা চলিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় দেখা যায় না। উদাহরণ দিতেছি।

ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে। [ গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ ]।

—সুভারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার—( ঐ : সুভা )।

একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—[ ঐ ]।

যেন কোনো একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোনো একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ার স্রোত আসিয়া—[ ঐ ]।

মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়—[ গল্পগুচ্ছ : মধ্যবর্ত্তিনী ]।

শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। [ গল্পগুচ্ছ : ক্ষুধিতপাষাণ ]।

—নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার—[ গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]।

—একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য—[ গল্পগুচ্ছ : একটা আষাঢ়ে গল্প ]।

—একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়—[ মেঘদূত ][1]

তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল। [ নৌকাডুবি ]।

কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল। [ চতুরঙ্গ : দামিনী ]।

---

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল।

বিশেষণ পদকে বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করাও বোধ হয় ইংরেজীর অনুকরণেই হইয়াছে। যেমন—

—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে? [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। [ মেঘদূত ]।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

**Appositional genitive** বা সমানাধিকরণ সম্বন্ধ পদের প্রয়োগও ইংরেজীর অনুকরণে করা হইয়াছে। যেমন—

আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে—[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি। [ রাজর্ষি ]।

—হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা—[ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়? [ গল্প চারিটি : মাল্যদান ]।

—চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে—[ গল্প চারিটি : রাসমণির ছেলে )।

ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল। [ গোরা ]।

কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন—[ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

অপরাপর ইংরেজিয়ানার উদাহরণ দিতেছি। এই সকল ইংরেজিয়ানা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাকৃত মনে করিলে ভুল করা হইবে।

আ-হা! কেমন করিয়া পারিত! (=how could they!) [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

আঃ, সে কি পরিবর্ত্তন। (=what a change!) [ ঐ ]।

সে কি আরামের ভুল! (=what a comfortable mistake!) [ ঐ ]।

—তখন তোমাদের সম্ভাবনাও (=even your possibility) তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। [ ঘাটের কথা ]।[১]

---

১। ভারতী, ১২৯১ সাল।

সহসা বলপূর্ব্বক (=forcibly) গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। [রাজর্ষি]।

তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া (=correcting himself) কহিলেন—[গল্পগুচ্ছ : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ]।

তাঁহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে (=to return to the poverty of his own home) কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। [গল্পগুচ্ছ : প্রায়শ্চিত্ত]।

—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর (many coils) মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ। [গল্পগুচ্ছ : একটা আষাঢ়ে গল্প]।

কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল (=was improper for him) [গল্পগুচ্ছ : ডিটেক্‌টিভ্]।

তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর (=distant) ও স্বতন্ত্র মনে হইত। [গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক]।

কি উদ্ধার, কি মুক্তি! (=what a rescue, what a release!) [গল্পগুচ্ছ: অধ্যাপক]।

অন্ধের শয়নগৃহে (=in a blindman's bedroom) যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না—[গল্পগুচ্ছ : দৃষ্টিদান]।

সে আমাকে নিরাপদে (=safely) ভালবাসিতে পারে। [চোখের বালি]।

রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও (=to take and not to take tea) প্রায়ই যাইত। [নৌকাডুবি]।

—কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না (=there was or was not) যাহা দেখিয়া—[গল্প-সপ্তক : হালদার গোষ্ঠী]।

—সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে (=in appearing and in not appearing at examinations) ওর সাত বছর গেল কেটে। [শেষের কবিতা]।

—এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস! (even that a badly written novel!) [নৌকাডুবি]।

—অজস্র গল্প-হাসিঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত (=atmosphere was charged with electricity)। [গল্প চারিটি: মাল্যদান]।

—সে অপরাধের জন্য ললিতা বারবার একটু বিশেষ করিয়াই ( =especialiy ) মাথা হেঁট করিয়াছে। [ গোরা ]।

এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তা'র সহায় হোন্! ( =God help him! ) [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

—সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া ( =a very healthy atmosphere ) বহিত। [ গল্প-সপ্তক : হৈমন্তী ]। ইত্যাদি।

সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে, বৈচিত্র্যের খাতিরে, পরপর অনেকগুলি বিশেষণের অথবা ক্রিয়া বিশেষণের প্রয়োগ পাওয়া যায় ( তুলনীয়—ইংরেজী অলঙ্কার asyndaton )। যেমন—

সুরমা হর্ষে, গর্ব্বে, কষ্টে কহিল—[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ রেখা টানিয়া দিয়া গেছে। [ গল্পগুচ্ছ : মধ্যবর্ত্তিনী ]।

—সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি—[ গল্পগুচ্ছ : দৃষ্টিদান ]।

—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের—[ গল্পগুচ্ছ : ছুটি ]।

কোন লেখকই আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালায় সংস্কৃত পদ্ধতির সমাসের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রায় সকল রকমের সমাসেরই উদাহরণ মেলে। তবে তিনি বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় ( বিশেষণে বিশেষণে ) এবং তৃতীয়া-তৎপুরুষ এই তিন শ্রেণীর সমাসের প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন। নিম্নে উদাহরণ দিতেছি। চলিত ভাষা অবলম্বনে লেখা বলিয়া শেষের দিকের রচনায় সমাসের প্রয়োগ অল্পই।

[ বহুব্রীহি ]—কলসকক্ষ মায়ের ; স্বর্ণচ্ছায়াম্লান সন্ধ্যালোকে ; রুদ্ধগবাক্ষ দেওয়ালের মধ্যে ; একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয় ; গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের ; রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ ; নির্ব্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথে : সাস্পৃহ কৌতূহলে ; ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী ; গৌরতনু উলঙ্গ শিশুদের মত ; শুষ্ককুলায় আম্রবনে ; ক্ষীণজ্যোৎস্ন আকাশতলে ; স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী ; ইত্যাদি।

[ কর্ম্মধারয় ( বিশেষণে বিশেষণে ) ]—কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা; হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ ; বিরাটভীষণ রমণীয়তা ; স্নিগ্ধবিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা ; নিভৃতনিস্তব্ধ বিশ্রাম ; মূকবৃহৎ অব্যক্তভাষায় ; স্তিমিত-গোপন গতিতে ; ইত্যাদি।

[ তৃতীয়া-তৎপুরুষ ]—উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র ; ক্ষমাহীন ; উৎপাতহীন শূন্যতা ; খণ্ড-কিরণখচিত ; কৌতুকতীব্র কটাক্ষ ; কালিমাঘন ; তরুপল্লব-নিবিড় নিদ্রিততীরে ; ইত্যাদি।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সহিত সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ধাঁচের সমাস সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন। যেমন—

পাতা-দিয়া-ছাওয়া ; তাঁহারাহীন ; আর-এক-জন-কে ; ছাতে-বিছানো ; রৌদ্রে-দেওয়া ; সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত ; যা-খুসি-তাই ; না-দেখতে-পাওয়াটাই ; ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ—

'শরীরমন,' 'হৃদয়মন,' 'দেহমন,' 'মা-খুড়ি ;' 'খ্যাতি প্রতিপত্তি সুখ সম্পদ সৌভাগ্য ; ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রয়োগে এক স্থলে নূতনত্ব আছে।—

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল। [ নৌকাডুবি ]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে 'এবং' শব্দের বিচিত্র অর্থে প্রয়োগ আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায়ও এই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব কিছু পরিমাণ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ—

—কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং ( =অথবা ) গায়ে পড়িয়া ভাষ্য দ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না। [ কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]।

সে আমাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং ( =কিন্তু ) বুঝিতে পারিতেছে না। [ গল্পগুচ্ছ : সুভা ]।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং ( =উপরন্তু ) অধিকতর সঙ্গত— [ আলোচনা ]।[১]

১। সাধনা, ১৩০১-০২ সাল, পৃঃ ৪৮৬।

—তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট অনাবৃত এবং ( =অথচ ) বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [ গল্প চারিটি : দর্পহরণ ]।

বলাবাহুল্য মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং ( =সেই জন্য ) এ চিঠিগুলি হিমালয়ের শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। [ জীবনস্মৃতি ]।

অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং ( =এমন কি ) সেই পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। [ ঐ ]।

সচরাচর যে স্থলে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার না করিয়া স্বতন্ত্র বাক্যের প্রয়োগ হয় এমন স্থলে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় 'এবং' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দ্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতরা বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত। [ গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র ]।

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত-বায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। [ গল্পগুচ্ছ : দালিয়া ]।

—যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্ত-কালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুর-বাড়ীর একটি বিরলকক্ষে চৌদ্দ বৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি— [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল ; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহ চীৎকারে যাহা চাহে—[ সূচনা ]।২

—মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষপ্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে। [ চোখের বালি ]।

ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ মনে করিতে পারি নাই, এবং তাহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। [ জীবনস্মৃতি ]।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কালের রচনাতে 'ও' এই সংযোজক অব্যয়েরও এইরকম প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

২। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪।

এখানকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিণ্টন খুলিয়াও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন—[ ভুবনমোহিনী প্রতিভা ]।

অবশেষে আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন ও সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপরে বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌড়ী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ কাহারও মনেও নাই। [ সরোজিনী প্রয়াণ ]।

দুই একস্থলে ইংরেজী কায়দার মত 'এবং' শব্দ দিয়া বাক্যের আরম্ভ করা হইয়াছে। যেমন—

অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার চতুর লোককে স্বামীর নিত্য অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলী তাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। [ গল্পগুচ্ছ : তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি ]।

'দা' ধাতু ঘটিত কথ্যভাষামূলক প্রয়োগ ( idiom ) রবীন্দ্রনাথের গদ্যে প্রচুরভাবে পাওয়া যায়। যেমন—

নিদ্রা দিতাম ; বাতাস দিতেছিল ; বামহস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে ; তাহার নতনেত্রের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দিয়াছে ; এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেচে ; পাড়ায় একটা কুয়ো দিস্‌নে কেন ? বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয় ; ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ প্রিয় শব্দ বা বাক্যাংশ আছে। সকল লেখকেরই এই রকম থাকে। 'বিশ্ব' কথাটি সমাসের প্রথম পদ হিসাবে প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন—

বিশ্ব-জগৎ, বিশ্ব-গ্রন্থ, বিশ্ব-হৃদয়, বিশ্ব-ব্যাপী, বিশ্ব-সংসার, বিশ্ব-পৃথিবী, বিশ্ব-প্রকৃতি, বিশ্ব-নিয়ম, বিশ্ব-বিধাতা, বিশ্ব-বিজয়ী, বিশ্ব-সঙ্গীত, বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-পরিধি, বিশ্ব-রচনা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ; ইত্যাদি।

নিম্নে উদ্ধৃত শব্দগুলির প্রয়োগ কম বেশি প্রচুরভাবে পাওয়া যায়।

[ কঠিন ] কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা ; নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি ; কঠিন দূরত্ব ; ইত্যাদি।

[ অপরিসীম ] অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি ; অপরিসীম বিচ্ছেদ ; অপরিসীম বিস্ময়জনক ; অপরিসীম মাধুর্য্য ; ইত্যাদি।

[ নিরতিশয় ] নিরতিশয় নবীন ; নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক ; নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত ; নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা ; নিরতিশয় তনিমার সহিত ; নিরতিশয় হেয় ; ইত্যাদি।

[ দুঃসহ ] দুঃসহ আনন্দ-বেদনা ; দুঃসহ বিস্ময়ে ; ইত্যাদি।

[ খামকা ] খামকা বলিলেন ; খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের ! পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে ; নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে হইল ; ইত্যাদি।

[ অপরূপ ] অপরূপ গাম্ভীর্য্যে ; অপরূপ সৌন্দর্য্যে ; ইত্যাদি।

[ উদার ] উদার রাজপথ ; উদার আহ্বান ; ইত্যাদি।

[ কেবলি ] কেবলি অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিতেছে ; তৃষ্ণার্ত্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মত কেবলি জাগিয়া আছে ; অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দুইচোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল ; ইত্যাদি।

বহুবার-ব্যবহৃত বাক্যাংশের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়—'বোধ করি,' 'অনুমান হয়,' 'মনে কর,' 'ক্ষণে ক্ষণে।' এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি 'মোদ্দা কথা' এই বাক্যাংশটিও একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। (এই বাক্যাংশটি পরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় একটা মুদ্রাদোষের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।) যেমন—

মোদ্দা কথা, সহসা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট্ রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

মোদ্দা কথাটা হচ্চে—[ লিপিকা : সুয়োরাণীর সাধ ]।

'দ্বারা' শব্দের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। ইহা ইংরেজী 'by' শব্দের প্রয়োগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।—

'অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা রহস্য প্রাপ্ত' ; নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্ল্লভ' ; 'অব্যক্ত হৃদয়ভারের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন' ; ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার খুব বেশি করা হয় নাই। কিন্তু যে যে স্থানে করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বত্রই সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত। উদাহরণ—

এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির ; নিরলসা তন্বী নদীটি ; অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার ন্যায় ; একটি মূর্ত্তিমতী ট্র্যাজিডি ; বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী ; মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী ; নির্জ্জননদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মত ; চৌদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির ; পার্ব্বতী নদী ; কুণ্ঠিতা লেখনী ; ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী ; বাতায়নবর্ত্তিনী এই স্তব্ধমূর্ত্তিটি ; সঙ্গিবিহীনা বালিকার ; হেমনলিনী যখন পলায়নপরা হইয়াছিল ; ইত্যাদি।

'বাতায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের'—এই স্থলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ অনুসারে শুদ্ধ। তথাপি এইরূপ স্থলে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়াছেন। যেমন—'কলালাপপরায়ণ নারী সম্প্রদায়'।

নিম্নের উদাহরণটিতে 'ভালবাসা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে। 'ভালবাসা আমার অপেক্ষা মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী—' [ গল্পগুচ্ছ : ত্যাগ ]।

বাঙ্গালার সাধুভাষায় শব্দরূপে ষষ্ঠীর একবচন এবং প্রথমার বহুবচনের '-এর,' '-এরা' এই প্রত্যয় কেবল ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্যত্র '-র' এবং '-রা'। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যের ভাষায় কথ্যভাষার প্রভাবে '-এর', '-এরা' বিভক্তির পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দে '-র', '-রা' প্রত্যয় কিছু কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার রচনায় ইহা মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। যেমন—

ব্রহ্মত্রর [ সমস্যাপূরণ ] ; বোনরা [ অতিথি ; রাজটীকা ] ; পুরুষরা [ আপদ ] ; মহেন্দ্রর, পছন্দর, চৈত্রর [ চোখের বালি ] ; দৈবর, বাক্সর [ নৌকাডুবি ] ; অক্ষয়কুমার দত্তর [ জীবনস্মৃতি ] ; ইত্যাদি।

গুণবাচক, ভাববাচক ও অ-বস্তুবাচক শব্দে নির্দ্দেশক প্রত্যয় '-টা', '-টি'র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথই বেশি চালাইয়াছেন। (প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠিক এই রকম ভাবে এবং এই অর্থে '-খানি' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল ; যেমন—"মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।" রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রত্যয় ব্যবহার করেন নাই এমন নয় ; যেমন 'চাউনি খানি।') কাব্যের ভাষা হইতেই এই প্রয়োগ গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ—

হাসিটি দৃষ্টিপাত কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে ; নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা ; আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল ; শীতের রৌদ্রটি ; হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি ; সকালবেলাকার আলোটি ; সূর্য্যাস্তটি ; সেই গুহার অন্ধকারটা ; তাঁকে দেখিতে-না-পাওয়াটাই ; চলে' যাওয়াটাকে ; তাঁকে ব্যঙ্গ করাটা ; ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ভক্ত। সেগুলি এই—

[ -ইমা ( =সংস্কৃত ইমন্ ) : ] ভাবের জড়িমা ; নিরতিশয় তনিমার সহিত ; রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে ; সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া ; শীতের জড়িমা ; কালিমাঘন ; ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত ; ইত্যাদি।

[ -তর : ] এমনতর ( এমনতরো ) ; কেমনতর ; ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর ( =নূতন ধরণের ) ; অমনতর ; তেমনিতর ; যেমনতর ; ইত্যাদি।

[ -পনা : ] এমনতরো কাঙালপনা ; গৃহিণীপনা ; গিন্নিপনা ; দুরন্তপনা ; ইত্যাদি।

'-পনা' প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি এখন মেয়েদের ভাষাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অনেক বিশিষ্ট-প্রয়োগ ( idiom ) মেয়েদের কথা হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন—

( যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, ) তখন সে আর হাত পা আছড়াইয়া বাঁচে না। [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]।

পুরুষমানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

সর্ব্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া—[ চোখের বালি ]।

চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোন কাজ নিজের হাতে করিতে পারে। [ ঐ ]।

রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নূতন শব্দসৃষ্টি প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে—কৌতুক বা সরসতার খাতিরে অথবা প্রয়োজনের জন্য।

সরসতার ( humour ) জন্য সৃষ্ট শব্দের উদাহরণ—

—মেয়েটি রাওলপিণ্ডজার ( =রাওলপিণ্ডের মেয়ের ) চেয়ে ভালো দেখিতে। [ গল্পগুচ্ছ : ক্লেল্ ]।

—এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি (=অনুকূল বাবুর পুত্র) রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে। [ গল্পগুচ্ছ : খোকাবাবু ]।

রমেশানী (=রমেশের স্ত্রী) [ নৌকাডুবি ]।

প্রয়োজনবশতঃ সৃষ্ট শব্দের উদাহরণ—

সংস্কৃতায়িত (=Sanskritized) ভাষা ; প্রাত্যহিক ভোগ ; প্রাত্যহিক সংসার ; বন্ধুনী (=বন্ধুর স্ত্রী) ; আলাপিতা (=যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে এমন নারী) ; ইঁটের কলেবরওয়ালা ক'লকাতা ; সিংহিনী (=সিংহের স্ত্রী) ; দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা ; বাহ্যিক ; ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে ব্যাকরণদুষ্ট পদ অথবা পদের অপপ্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তাঁহার ভাষাজ্ঞান অসাধারণ, সংস্কৃতেও দখল অল্প নহে। অল্প দুই একটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ বা পদের অপপ্রয়োগ যাহা নজরে পড়িয়াছে তাহা বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সে লেখা ভা র তী-তে প্রকাশিত ক রু ণা উপন্যাসটিতে 'সখ্যতা' এই শব্দটি পাইয়াছি। তারপর 'সুভা' গল্পটিতে 'অস্তমান চন্দ্রের মত'—এই বাক্যাংশে 'অস্তমান' শব্দটি পাই।[১] 'অস্তমিত (=অস্তম্+ইত)' এই পদদ্বয়কে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত একটিমাত্র পদ মনে করিয়া 'শানচ্' প্রত্যয় করিয়া 'অস্তমান' পদটি গঠিত হইয়াছে। অথবা 'অস্তায়মান' এবং 'উদীয়মান' এই দুইটি কথার জোড় কলম (contamination)-এ এই শব্দটি কবির মনে উদিত হইয়াছিল। দুই এক স্থলে ণিজন্ত ক্রিয়াপদের

---

১। 'অস্তমান' শব্দটি এখন বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে।

স্থলে অণিজন্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন—'উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া (=উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া) দেখিল' [ অতিথি ]; 'ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে' [ জীবনস্মৃতি ]। কথ্যভাষায় ণিজন্ত, অণিজন্ত উভয় স্থলেই সাধারণতঃ 'উল্টে পাল্টে' বলা হইয়া থাকে। তাহা হইতে শুদ্ধ করিতে গিয়া এই রকম ভুল হইয়াছে। যো গা যো গ উপন্যাসের মধ্যে এক স্থলে 'ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ' কথাটি আছে। এই 'ভঙ্গজ' শব্দটি সম্ভবতঃ 'ভঙ্গ' আর 'বঙ্গজ' এই দুইটি শব্দের জোড়কলম ( contamination ) করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে।

দুই এক স্থলে তৎসম শব্দের তদ্ভব বিশেষণের প্রয়োগ ঠিক সঙ্গত হয় নাই। যেমন—'পাকা আম্র' [ মধ্যবর্ত্তিনী ]; 'ক্ষেপা যুবক' [ একটি আষাঢ়ে গল্প ]।

নিম্ন উদ্ধৃত স্থলে 'পিণাক' শব্দটি 'বিষাণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—'রুদ্রের প্রলয়পিণাকের মত তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সঙ্গীত নাই।' [ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ]। এখানে যদি 'ধনু' অর্থ লইতে হয় তাহা হইলে 'সুর' শব্দে 'টঙ্কারধ্বনি' বুঝিতে হইবে। 'ষ্টিমারের পিণাক-ধ্বনিও মান্য করে না' [ সরোজিনী প্রয়াণ ]।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ কিছু নাই। দুই এক স্থলে যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই। 'করা' বা 'হওয়া' ধাতুর পরিবর্ত্তে স্থানবিশেষে 'পাওয়া' ধাতুর প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পাই—'চেষ্টা পাইও না' [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]; 'ক্ষোভ পাইল' [ চোখের বালি ]।

অস্ত্যর্থ ধাতুর নিষেধে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় এবং তাহা হইতে সাধুভাষায় একটি বিশিষ্ট ধাতুর প্রয়োগ আছে। বর্ত্তমান কালে তাহার তিন পুরুষের রূপ কথ্যভাষায় যথাক্রমে—'নই; নোস্, নও, ন'ন্; নহে, নহেন।' পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় এইস্থলে সর্ব্বত্র 'না' এই নেতিবাচক অব্যয়ের

প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাতেও এই রীতি ঢুকিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথ্য- ও সাধুভাষার রচনাতে পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী 'না' শব্দের প্রয়োগ অ-সুলভ নহে। যেমন—

'আমি তোমার কাকা না ;' ( 'আমি তোমার কাকা নই ;' ) 'আমরা কিছু নিতান্ত শিশু না।' [ রাজর্ষি ]।

'এটা তত কঠিন না।' [ গল্পসপ্তক ঃ ভাইফোঁটা ]।

'সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।' [ শিক্ষার মিলন ]।

'আমি টুরিস্ট না।' ( 'কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়।' ) [ শেষের কবিতা ]। ইত্যাদি।

সাধুভাষার রচনার মধ্যে যেখানে কথোপকথনের জন্য অথবা অন্য কারণে কথ্যভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অল্প স্থলেই কথ্য-ভাষার ( বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদের ) বিশুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ কথ্যভাষার রূপের সহিত সাধুভাষার রূপ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। এই দোষ বাঙ্গালার সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগের গদ্য রচনায় পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় আবার কথ্যভাষার বিভিন্ন উপভাষার পদ মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ—

চারিদিকে লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে—[ য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র ]।[১]

তাই কি, সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে ? সন্ধ্যার পর এক আধ ঘণ্টা পড়ালেই ত ঢের হয়। [ চোখের বালি ]।

দিদি, আর ওসব কথা বলিস্‌নে ভাই ! আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। [ গল্পগুচ্ছ ঃ দালিয়া ]।

'মশায় আমার প্রণাম জানবেন, আমি চল্লেম।' 'আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।' [ গল্পগুচ্ছ ঃ মুক্তির উপায় ]।

নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি। [ গল্পগুচ্ছ ঃ আপদ ]।

---

১। ভারতী, ১২৮৬ সাল, পৃঃ ৪২।

একই রচনার মধ্যে কোন পাত্রপাত্রীর কোনো উক্তি সাধুভাষায় এবং কোনো উক্তি কথ্যভাষায় দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পগুলির একটি বিশিষ্ট রীতি। সাধুভাষায় লিখিত উক্তিগুলি যেন অনেকটা ইংরেজী reported speech-এর মত। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাবে ?"

"রহমৎ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্চে !"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—"সম্বরাকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা।" [ গল্পগুচ্ছ ঃ কাবুলিওয়ালা ]।

এইবার রবীন্দ্রনাথের বানান-পদ্ধতি (orthography)-র সম্বন্ধে কিছু বলিব। 'একমাত্র'-বাচক অব্যয়াংশ (emphatic particle) 'ই' এবং 'অপিচ'-বাচক অব্যয়াংশ (inclusive particle) 'ও' যে শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের পিছনে প্রত্যয়ের মত যুক্ত হয়, তবে সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র থাকে। রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের রচনার মধ্যে এই অব্যয়াংশ দুইটি—বিশেষ করিয়া 'ই'—পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সন্ধিভূত হইয়াছে দেখা যায়। যেমন—'সকলি,' 'কেবলি,' 'তাহাদেরি,' 'পূর্ণিমারি,' 'আমারো,' 'আরো,' ইত্যাদি। তেমনি 'আর এক' স্থলে 'আরেক', 'এক এক' স্থলে 'একেক' এই সন্ধিবদ্ধ রূপই দেখা যায়।

র-কারকে রেফ করা য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা যায়। যেমন—'কর্বার জন্যে'। তারপর পাওয়া যায় ঘরে-বাইরে এবং আর দুই একটি রচনায়। কথ্যভাষার ক্রিয়াপদে প্রত্যয়ের 'ছ' স্থানে 'চ' প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে কোথাও একতন্ত্রতা (consistency) নাই। যেমন—'দেখেচি', 'শুনেছি' [ গোরা ]; 'পেরেচি', 'করেছি' [ ঘরে-বাইরে ]; 'উঠেছে', 'রেখেচে' [ পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী ]; 'পড়েচে', 'দিয়েছে' [ দুই বোন ]।

কতকগুলি দেশী, বিদেশী এবং তদ্ভব শব্দের উষ্ম (sibilant) ধ্বনির বানানে রবীন্দ্রনাথ নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। শ, ষ, স, এই তিনটি উষ্মধ্বনির মধ্যে ষ-কারেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তাহার পর শ-কারের যেমন—'মাকড়ষা'; 'কুয়াষা', 'কুয়াশা'; 'বকশিষ,' 'বখশিশ'; 'খাষ,' 'খাস'; 'চষমা,' 'চশমা'; 'শিশুগাছ,' 'সিসুগাছ'; 'শীষা (=সীসক)'; 'শিকি পয়সা'; 'শাদা,' 'সাদা'; 'শহর,' 'সহর'; 'মুখোষ,' 'মুখোস'; 'খোলষ,' 'খোলস'; 'আপষ'; 'নালিষ'; 'একজিবিষণ'; 'আপিষ'; 'ইষা খাঁ'; 'বালিষ'; ইত্যাদি।

খণ্ড ত [ৎ]-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আকর্ষণ আছে। যেমন—'কাৎ,' 'মাৎ,' 'জিৎ,' 'পাৎলা,' 'বাৎলান,' 'মেরামৎ,' 'মজবুৎ,' 'কাৎলি,' 'সাঁৎরে,' 'মৌতাৎ,' 'মানৎ,' 'আড়ৎদার,' 'ফুরসৎ,' ইত্যাদি।

উ-কার এবং অ-কারের স্থলে অনেক সময় ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—'মারধোর (=মারধর),' 'মুখোমুখি,' 'ঘাড়মোড়,' 'ওল্‌টাইতে,' ইত্যাদি।
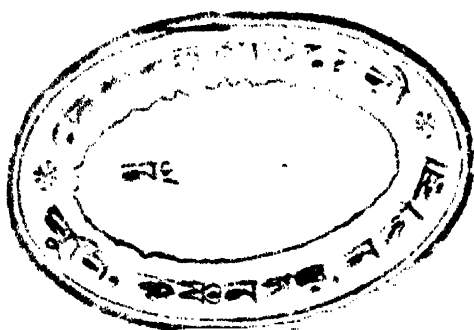
# একাদশ পরিচ্ছেদ

## রবীন্দ্রী ভঙ্গির বিবর্ত্তন

রচনাভঙ্গির ক্রমবিকাশ এবং পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। সে যুগ তিনটি এই—

'জ্ঞানাঙ্কুর-ভারতী' ( বা আদি ) যুগ, ১২৮৩ সাল হইতে ১২৯০ সাল।

'হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী' ( বা মধ্য ) যুগ, ১২৯১ সাল হইতে ১৩১৯ সাল বা ১৩২০ সাল।

'সবুজপত্র' ( বা তৃতীয় ) যুগ, ১৩২১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি চলিতেছে বলা যায়।

রবীন্দ্রী রীতির মধ্যযুগের প্রকৃত আরম্ভ ১২৯৮ সাল হইতে। ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৭ সাল পর্য্যন্ত সময়টা এই যুগের অরুণোদয় বলা যাইতে পারে। মধ্য যুগ অর্থাৎ ১২৯৮ সাল হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত সময়কে আবার তিন কালে ভাগ করা যাইতে পারে—হিতবাদী-সাধনার কাল ( ১২৯৮-১৩০২ সাল ), ভারতী-বঙ্গদর্শনের কাল ( ১৩০৫-১৩১৩ সাল ) এবং প্রবাসীর কাল ( ১৩১৪-১৩১৯ সাল )।

আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির অবিচ্ছেদ ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি লক্ষিত হয়। সবুজ-পত্রের ( বা তৃতীয় ) যুগে তাঁহার গদ্যভঙ্গি যেন একটা নূতন মোড় ফিরিল। ইহাকে ঠিক ক্রমবিকাশ বলা বোধ হয় শক্ত। এই যুগের প্রথমেই যে ছোট গল্পগুলি লেখা হয় তাহাতে অনেকটা পরিমাণে পুরাতন 'ভারতী-বঙ্গদর্শন' কালের ভঙ্গির রেশ অনুভূত হয়। তাহার পর হইতেই

রচনাভঙ্গি অন্যরকম রঙ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। এই যুগের আদর্শ (typical) রচনা ঘ রে-বা ই রে।

তৃতীয় যুগের রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এইগুলি। কথ্যভাষার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার। প্রথম প্রথম (যথা ঘ রে-বা ই রে-তে) পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার ক্রিয়াপদই মুখ্যতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, শেষের দিকের রচনাগুলিতে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষা হইতে আগত কতকগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন 'দিল' 'নিল')। বাক্যের মধ্যে কাব্যের ধাঁচে পদ সাজানো এই যুগের শেষের দিকের রচনায় লক্ষিত হয়। (যেমন, 'এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মত রাঙা, তার কাঁচা সোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াসা যেন।' [মালঞ্চ[১]]।) কথার ভঙ্গি অনপেক্ষিত (abrupt)। ভাষার ও ভাবের চটকে পাঠককে চমকিত করিয়া দিবার চেষ্টা জাগ্রত। চমকিত করিয়া দিবার এই সজ্ঞান চেষ্টা শে ষে র ক বি তা-য় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। সেইজন্য এই বইটি parody বা ব্যঙ্গ-রচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু এই ভঙ্গি যে এই যুগের অপরাপর প্রায় সকল রচনাতেই একটা কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চেষ্টাকৃত বলিয়া অনেক সময় এই যুগের রচনায় উপমা-উৎপ্রেক্ষায় বা অনুপ্রাসে পূর্ব্বকার সারল্য ও হৃদয়গ্রাহিতার অভাব লক্ষিত হয়। যমকের প্রয়োগ এই যুগেই আরম্ভ হয়। সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ বাক্যের শেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে: ইহাই বাঙ্গালা ভাষার রীতি। কিন্তু কাব্যের ভাষায় এবং মুখের ভাষায়, বিশেষ বিশেষ অর্থব্যঞ্জনার জন্য, কখনও কখনও এই রীতির ব্যতিক্রম হয়। এই যুগের রচনায় ক্রিয়াপদের এই রকম ব্যত্যাস খুবই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি যুগের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। শেষের যুগের রচনায় কিন্তু

১। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ সাল, পৃঃ ৫৬৯।

ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্য অবশ্য বিষয়বস্তুই বিশেষ করিয়া দায়ী।

এইবার রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান গদ্যরচনা লইয়া আলোচনা করিব, এবং তাঁহার রচনা হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রচনাভঙ্গির অভিব্যক্তির ধারা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনাটি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী,' এবং 'দুখসঙ্গিনী' নামক তিনটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা। জ্ঞা না ঙ্কু র ও প্র তি বি ম্ব নামক মাসিক পত্রের চতুর্থ খণ্ডে, ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় ( পৃষ্ঠা ৫৫৩ হইতে ৫৫০ ) প্রকাশিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনেরো। এই রচনাটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ জী ব ন-স্মৃ তি-তে করিয়াছেন। ইহার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই, এবং তাহা থাকিবারও কথা নহে, তথাপি কবির প্রথম গদ্যরচনা হিসাবে প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কি রকম গদ্য লিখিতেন, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই আছে। সুতরাং এই বিস্মৃতপ্রায় রচনাটির প্রথম হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে আশা করি বৃথা বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিম্নে উদ্ধৃতাংশ যতদূর সম্ভব মূলের অনুগত করিয়া দেওয়া হইল।

মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে

ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালীর নির্জ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতি-কাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয় চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন।

উদ্ধৃত অংশটি প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ। অনুচ্ছেদগুলি এই রকমই বড় বড়। বালকের রচনা হইলেও ইহা যে কোন কবির লেখা তাহা উপমাদির ঘটা হইতে স্পষ্টই বুঝা দুরূহ নহে। আর রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভঙ্গির পূর্ব্বাভাসও ইহাতে ঈষৎ লক্ষিত হয়। উপমাদির প্রয়োগ, একাধিক অলঙ্কারের দ্বারা উক্তি সমর্থন—ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাক্য-প্রয়োগরীতির পরিচয়ের অসদ্ভাবও ইহাতে নাই।

যেমন—'কেননা' শব্দ দিয়া সমর্থক বাক্যের প্রয়োগ; 'এবং' শব্দ দিয়া বিভিন্ন বাক্যের সংযোজন, 'হওয়াতে' এই পদের স্থলে 'হইয়া' এই অসমাপিকা পদের প্রয়োগ; ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের মাস কতক পরেই (১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে) ভা র তী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ভা র তী-র মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যসাহিত্যের আসরে রীতিমত প্রবেশ করিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই মে ঘ না দ ব ধে র সমালোচনা মে ঘ না দ ব ধ কা ব্য প্রবন্ধের কিয়দংশ বাহির হইল। পরবর্ত্তী অংশ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন এই কয়মাস ধরিয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনার মধ্যে নানা কারণে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জী ব ন স্মৃ তি-তেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। হি ত বা দী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কবির দ্বিতীয় গদ্যরচনা বলিয়া ইহারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সুতরাং এই প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

আমাদের পাঠক সমাজের রুচি ইংরাজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে, অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক্, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজী গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর, তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন-সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বর ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে, ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ-পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।[১]

১। ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৪ সাল, পৃঃ ৮।

উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথের অর্থান্তরন্যাস-বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির ( explanatory style-এর ) একটি সুন্দর উদাহরণ মিলিবে।

ভা র তী-র প্রথম বর্ষের তৃতীয় ( আশ্বিন ) সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পরবর্ত্তী সালের ভাদ্র সংখ্যা অবধি চলে। উপন্যাসটির নাম ক রু ণা। ইহা পুনর্মুদ্রিত ত হয়ই নাই, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথায়ও ইহার উল্লেখ করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।

বইটির ভাষা স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর। দ্রুততালে ঘটনাদির বর্ণনা চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উত্তমপুরুষে গ্রন্থকারের উক্তি আছে। অতীতকালের সহিত অতীতকালের অর্থে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। কথোপকথনের মধ্যে সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার মধ্যে মধ্যে মিশ্রণ হইয়াছে। ভাষার নমুনা হিসাবে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপন অভাব লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব্ব করিতেন। গল্প-বাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড় অনুকূল, কারণ নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আর কেহ ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডাল পালা ছাঁটিয়া ছুটিয়া দিলে সার মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত শিখিয়াই লেখা পড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাল্কী আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পড়িয়া গুটি কতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্ত্তাদের সম্মুখে পাল্কীতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন "ও নিধি, আজ তোমাকে দেখতে এয়েচেন।" নিধি কহিলেন "না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আর

হোচ্চে না।" কন্যা-কর্ত্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর দিনই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি; পাড়ার একটি এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড় তবে বলিও বিষ্‌প্‌স কলেজে। দৈবক্রমে বিবাহ-সভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কলেজে! ভাগ্যে কন্যা-কর্ত্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।১

তৃতীয় বর্ষের (১২৮৬ সালের) ভা র তী-তে যু রো প-যা ত্রী কো ন ব ঙ্গী য় যু ব কে র প ত্র বাহির হইতে থাকে। এই লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। ক্রিয়াপদগুলি সবই কথ্যভাষার, তবে বিভিন্ন উপভাষার রূপগুলি অনির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। যেমন,—'উঠ্‌লেম', 'দেখলাম', 'করতেম', 'ভাবতুম', ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের বানানেও নূতনত্ব আছে। যেমন,—'পোড়লেম', 'বইচে', 'দেখাচ্চে', 'কোল্লে', 'বোল্লেন', 'কর্বার', 'হোয়ে', 'বোলে', ইত্যাদি। সাধুভাষার ক্রিয়াপদেরও মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ আছে। অমার্জ্জিত হইলেও ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছন্দ। উদাহরণ হিসাবে নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আমরা এখন Devon Shire এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিক হাস্য ময়। চারিদিকে পাখী ডাক্‌চে, ফুল ফুটচে। যখন Tunbridge Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখানে যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরী করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়; কিন্তু Torquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিংএর কামানের মত এমন একটি বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোঁড়া যায়, আর সেই বাণ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুল শরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এত ফুল।২

১। ভারতী, ১২৮৪ সাল, পৃঃ ১৭৬-৭৭।

২। ভারতী, ১২৮৬ সাল, পৃঃ ১৩০-৩১।

তাহার পর উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে বৌ ঠা কু রা ণী র হাট। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহা ভা র তী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে সমাপ্ত হয় এবং ১২৯০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের বিশেষত্ব—ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ—ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। ভাষা সহজ, সরল সাধুভাষা। ঘটনার বর্ণনা দ্রুততালে চলিয়াছে। অলঙ্কারের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্পই। অনুপ্রাসের প্রয়োগ নাই। ইংরেজিয়ানা অল্পস্বল্প আছে। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই কম। কথোপ-কথন সাধুভাষায় দেওয়া হইয়াছে। 'ঠাহরাইবেন না', 'ইচ্ছা পূরাইতে', 'তিষ্ঠিতে', 'তলাইয়াছিলেন', ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। ভাষার নমুনা হিসাবে দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি বর্ণনাত্মক বঙ্কিমী পদ্ধতির, দ্বিতীয়টি নিজস্ব অলঙ্কৃত পদ্ধতির উদাহরণ।

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে; গৃহদ্বার রুদ্ধ; দৈবাৎ দু'একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন। "কেন? বিভা? কি হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"১

দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোর হৃদয় রাজবাটি আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছচারিতা, রক্তলালসা, দুর্ব্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল।২

১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এক যুগসন্ধির আবির্ভাব হইল। ১২৯১ হইতে ১২৯৭ পর্য্যন্ত এই যুগসন্ধির কাল। তাহার পর ১২৯৮ সালে দ্বিতীয় যুগোদয়। ১২৯১ সালেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত

১। বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ৮-৯। ২। ঐ, পৃঃ ১৯১।

হয়। আর তাঁহার যে নিজস্ব গদ্যভঙ্গি তাহার সমস্ত লক্ষণগুলি এই সময়ে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি ছোট গল্প এই সালেই প্রকাশিত হয়, প্রথমটি ভা র তী-তে ( কার্তিক সংখ্যা ), নাম 'ঘাটের কথা', দ্বিতীয়টি ন ব জী ব নে ( অগ্রহায়ণ সংখ্যা ), নাম 'রাজপথের কথা'।

উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির ( অধিক না হইলেও ) সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং আত্ম-দৃষ্টিমূলক ( subjective ) এবং ব্যাখ্যাত্মক ( explanatory ) বর্ণনাভঙ্গি এই দুইটি রচনায় এবং এই যুগের অন্যান্য রচনায়ও দেখা দিয়াছে। ভাষা বিশেষ অলঙ্কৃত না হইয়াও হৃদয়গ্রাহী এবং মনোরম। ভাষার জড়তা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। পদ ও শব্দ প্রভৃতির বিসদৃশ প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। অনুপ্রাসের ব্যবহার এখনও আসে নাই, তবে শ্লেষের প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছে। যেমন, '—উপন্যাসে চার চোখে বিস্তর হাঙ্গামা হয়, আর সত্য ঘটনায় শুষ্ক জমাখরচের মহলে চার চোখে ষোল গণ্ডার বেশী হয় না।' [ সরোজিনী প্রয়াণ ]।[১]

বিশুদ্ধ সরসতার ( humour ) পরিচয়ও এই সময়ের রচনার মধ্যে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। যেমন, '( আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ডুবিল না··· ) না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না।'[২]

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম দুইটি গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে এই সময়ে তাঁহার গদ্যরচনা-ভঙ্গির যে কতদূর পরিণতি হইয়াছিল তাহা সহজে বোধগম্য হইবে।

তোমাদের প্রপিতামহীরা সে দিন সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো একটু আলোময় করিবার জন্ত গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু নিচু

১। ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ৩৭১। ২।ঐ।

রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত হইত না।১

কি প্রখর রৌদ্র ; উহু-হুহু ; এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধুলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমিষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপর বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি। [ রাজপথের কথা ]।২

পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে তৃতীয় উপন্যাস রা জ র্ষি-র অধিকাংশ বা ল ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি তাহার পরবৎসর সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। রা জ র্ষি বাহির হইবার পূর্ব্বে বা ল ক পত্রিকায় ( বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ) 'মুকুট' নামে একটি ছেলেদের উপযোগী বড় গল্প প্রকাশিত হয়। 'মুকুট'-এ এবং রা জ র্ষি-তে বর্ণনা ঘটনাবহুল, এবং সেই ঘটনাও বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। রা জ র্ষি-র মধ্যে বেশির ভাগ কথাবার্ত্তা সাধুভাষায় লিখিত, অল্প কয়েক স্থল চলিতভাষায়।

রা জ র্ষি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এটি একটি বাহ্যদৃষ্টিমূলক ( objective ) দৃশ্যবর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপ বাহ্যদৃষ্টিমূলক ( objective ) বর্ণনা বড় বেশি নাই।

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্যকিরণে

১। ঐ, পৃঃ ৩০৪। ২। নবজীবন, ১২৯১-৯২, পৃঃ ৩০১-০২।

দশদিক ঝলমল্ করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিল।[১]

ইহার পর ১২৯৭ সাল অবধি কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা নাই, কেবল কতকগুলি প্রবন্ধ। ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। তাহার পর ১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের এক নূতন প্রেরণা আসিল। এই যুগকে মোটামুটি 'সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন'-এর যুগ বলা যাইতে পারে। এই দশ বারো বৎসরের ভিতর বাঙ্গালা গদ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয়রূপে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইল। এই যুগের সূত্রপাত ১২৯১ সালে হইলেও প্রকৃত আবির্ভাব হইল ১২৯৮ সালের গোড়ার দিকে হি ত বা দী পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এই বৎসরের প্রথমে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই পত্রিকার আবির্ভাব হয় এবং ইহারই প্রথম কতিপয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি এই—'দেনা পাওনা,' 'গিন্নী,' 'পোষ্টমাষ্টার,' 'তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি,' 'ব্যবধান' এবং 'রাম-কানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা।'

এই ছয়টি গল্পের মধ্যে 'দেনা পাওনা'ই বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত গল্প। এই গল্পটির ভাষাও অপর গল্পগুলির ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বাক্য-

১। ১৩৩১ সালের সংস্করণ, পৃঃ ২৫।

গুলি ছোট ছোট। ভাষাও অলঙ্কারবর্জ্জিত, ঘটনার বর্ণনা দ্রুতগতি। ইহার ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড় তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

বাকি পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি—'পোষ্টমাষ্টার' ছাড়া সবকটিই যথাসম্ভব অলঙ্কারবর্জ্জিত ভাষায় রচিত। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির ভাষায় একটু বিশেষত্ব আছে। ভাষা এমন কিছু অলঙ্কৃত নয়, তবুও আত্মদৃষ্টিমূলক (subjective) বর্ণনার দরুন গল্পটির ভাষা ইহার পারিপার্শ্বিকতার সহিত একীভূত হইয়া জমাট হইয়া উঠিয়াছে। এত স্বল্প আয়োজনে ভাষা ও ভাবের রস-ঘন সম্মিলন রবীন্দ্রনাথেরও অন্য কোন গল্প বা অন্যবিধ রচনায় পাওয়া দুর্ল্লভ। ঘটনার বাহুল্য একেবারেই নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বড় বড় জটিল (complex) ও যুক্ত (compound) বাক্যেরই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানব-হৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে সা ধ না পত্রিকার আবির্ভাব হইল। সা ধ না-র পত্রে পত্রে রবীন্দ্রনাথ "গদ্য পদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে" লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গিও এই সময়েই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। ভাষা দিন দিন পুষ্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়কার প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি।

আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদের অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন! সেও বর্ত্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের অহঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড় বড় জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্য সুহৃদদিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে। [ বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য ]।১

সা ধ না ১৩০২ সালে উঠিয়া যায়। তাহার পর ১৩০৫ সালে আবার ভা র তী-তে গল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩০৮ সাল হইতে ব ঙ্গ দ র্শ নে র সম্পাদনভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যক্ত হয়। এই সময়টাতেই অর্থাৎ ১৩০৫ হইতে ১৩১২-১৩ সালের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি যাহা সাধনার যুগে অর্থাৎ ১২৯৮-১৩০২ সালে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অপূর্ব্বরূপে বিকশিত ও অলঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই সময়ে লেখা গল্পে উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। গদ্য পদ্যের মত সুষমাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই, থাকিলে বলিতে পারিতাম, এইরূপ অলঙ্কৃত, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, মহীয়ান্, অনবদ্য, মধুর গদ্যরচনা অন্য কোন ভাষায় আছে কি না। এই 'ভারতী-বঙ্গদর্শন'-এর যুগের রচনার নমুনা হিসাবে কতকগুলি অংশ তুলিয়া দিতেছি।

---

১। সাধনা, বৈশাখ, ১৩০২ সাল, পৃঃ ৫৭৫।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসিবার পূর্ব্বে সন্দেহ মাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারী-সৌন্দর্য্যের একটা ধ্যানমূর্ত্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই একথা বলিতে পারি না। সেই মূর্ত্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা গায়ে জামা হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই—কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুনশেষের অপরাহ্নে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোকরেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে জুতা পায়ে দিয়া জামা গায়ে দিয়া বই হাতে করিয়া দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না। [ গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উর্দ্ধমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল,— ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্ত কালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ীর একটি বিরলকক্ষে চৌদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কি সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত ! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে, 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল। [ গল্পগুচ্ছ : মণিহারা ]।

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্ম্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দীঘির পাড়ে জামগাছের ঘন পত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্য সাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল ; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল।

বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণজ্যোতি যখন একটি শান্ত সজলরেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে,—অপরিতৃপ্ত রঙ্গরসকৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। [ চোখের বালি ]।

এমন সময় পূর্ব্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শতশতাব্দীর পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চির-মিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পদচিহ্নহীন-তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে! তখন পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশী সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্প অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই। [ মেঘদূত ]।

ইহার পরবর্ত্তী যুগকে অর্থাৎ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ পর্য্যন্ত সময়কে 'প্রবাসী'র যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ের লেখায় অলঙ্কারের বাহুল্য পরিমাণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। অনুপ্রাসের ছটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষা স্বচ্ছ, লঘুগতি, আড়ম্বরহীন, মধুর। এই সময়ের প্রধান গদ্যরচনা গো রা এবং জী ব ন স্মৃ তি।

গো রা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্র বা সী-তে বাহির হইতে থাকে এবং ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে সম্পূর্ণ হয়। গো রা রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ উপন্যাস। ইহার পূর্ব্বে চো খে র বা লি এবং নৌ কা ডু বি ব ঙ্গ দ র্শ নে যথাক্রমে ১৩০৮-০৯ এবং ১৩১০-১২ সালে প্রকাশিত হয়। গো রা-র মধ্যেই সর্ব্ব প্রথম মুখের ভাষায় কথোপকথন লিখিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কেবলমাত্র 'মুক্তির উপায়' নামক গল্পে কথোপকথনের জন্য কথ্যভাষার ব্যবহার হইয়াছিল। নিম্ন-উদ্ধৃত অংশটি গো রা-র ভাষার উদাহরণ রূপে দেওয়া গেল।

গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কি সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ! ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে।

জী ব ন স্মৃ তি ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্র বা সী-তে বাহির হইতে থাকে। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার ভাষা গো রা-র ভাষা হইতে আরও আড়ম্বরবর্জ্জিত এবং আমার মনে হয় আরও সুমধুর। ভাষা কোথাও অনাবশ্যক রূপে পল্লবিত হইয়া ভাব বা বিষয়বস্তুকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তুলে নাই, অথচ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সমস্ত মাধুর্য্য ইহাতে বর্ত্তমান। এক হিসাবে জী ব ন স্মৃ তি-কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। উদাহরণ হিসাবে ইহা হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সন্ধ্যা হইয়াছে! মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপর জাগিয়া আছে, বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং" যাকে বলে! এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া "হা হতোহস্মি" করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ! না, হতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্ম্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

১৩২১ সালে স বু জ প ত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে অনেকগুলি গল্প, একটি উপন্যাস এবং কিছু কিছু গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

( কবিতার কথা বলিলাম না, কারণ তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে। ) এই সকল গদ্যরচনার ভাষা পূর্ব্বেকার সমুদয় রচনার ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এইটিকে তৃতীয় যুগ বা 'সবুজপত্র'-এর যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের ভাষার লক্ষণ এইগুলি।

অনুপ্রাসের পুনরাবির্ভাব। যমকের ব্যবহার। শ্লেষের প্রয়োগ অনেকটা চেষ্টাকৃত সূক্ষ্ম উক্তির ( epigram-এর ) ব্যবহার। সরল অথবা অপ্রকাশিত বা অনপেক্ষিত উক্তির দ্বারা পাঠককে চমকিত করিয়া দিবার অন্তস্তলগত সচেতন প্রচেষ্টা এই যুগের গদ্যরচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

স বু জ প ত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির ভাষা অলঙ্কারমণ্ডিত; অনেকটা গ ল্প গু চ্ছে র ধরণের। তবে আরও কাব্য-ঘেঁষা ( poetic )। বর্ণনার ভাগ, বিশেষ করিয়া পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির বর্ণনা, ইহাতে নাই বলিলেই হয়। গল্পগুলি প্রায় সবই, শুধু গল্পগুলি কেন উপন্যাসটিও, autobiographical অর্থাৎ পাত্রের বা পাত্রীর নিজ মনের ঘাতপ্রতিঘাত লইয়া রচিত। সেই জন্য কাব্য-ঘেঁষা ভাষা কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অশোভন হয় নাই। ভাষার উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কিন্তু একি করিতেছি? একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম? এমন সুরে আমার লেখা সুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম? মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রেই ত জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন। [ গল্পসপ্তক : হৈমন্তী ]।

চ তু র ঙ্গ সাধুভাষায় লিখিত হইলেও ইহার ভাষার ছাঁচ কথ্যভাষার। সর্ব্বনাম পদগুলির রূপ প্রায়ই সবই কথ্যভাষা হইতে গৃহীত। তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট। বাক্যগুলি ছোট ছোট। গল্পগুলির ভাষার অপেক্ষা চ তু র ঙ্গে র ভাষা অনেক হালকা ধরণের। ভাষার উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। উদ্ধৃত অংশটি ভয়ঙ্কর রসের একটি সুন্দর উদাহরণ।

সে দিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তা'র সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কি যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না অথচ তা'র নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মত ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আম-বাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় দুড়দুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনের জান্‌লা-দরজার ছিট্‌কিনীগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আস্‌বাবগুলাকে উলট্‌পালট্‌ করিয়া দেয়, পর্দ্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তা'র ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কি-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কি হইবে? এই ইতিহাসে সেগুলা জরুরী কথা নয়। [ চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস ]।

ঘ রে-বা ই রে রবীন্দ্রনাথের সপ্তম উপন্যাস। ইহা ১৩২২ সালে স বু জ প ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কথ্যভাষায় লেখা। চ তু র ঙ্গে র মত ইহার রচনাভঙ্গিও আকস্মিক বা অনপেক্ষিত ( abrupt style )। অলঙ্কারের প্রাখর্য্য আরও বেশী। এই অলঙ্কারের প্রাখর্য্য এবং ঔজ্জ্বল্য ঘ রে-বা ই রে র ভাষাকে অনেক পরিমাণে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। এই বইয়েই সর্ব্ব প্রথম 'সে ( তা- )' এই সর্ব্বনামের স্থলে 'ও' এই নির্দ্দেশক

সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক এক সম্প্রদায়ের লেখকের মধ্যে এই প্রয়োগ মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঘ রে-বা ই রে র ভাষার কিছু উদাহরণ দিলাম।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা ;—ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসেছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে তাহলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি ? কিসের জন্যে ? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে ?

প্রখর অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিতেছি—

—মদের ফেনা আর নটীর নূপুর-নিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন।

লি পি কা-র মধ্যে যে 'কথিকা' বা গল্পের টুকরা বা গদ্য কবিতাগুলি আছে তাহার অধিকাংশের লিখনভঙ্গি অনেকটা কাব্য-ঘেঁষা। তাহাই স্বাভাবিক। কাব্যের ভাষায় লেখা বলিয়া ইহাতে বাক্যে সাধারণ পদবিন্যাসের ব্যত্যাস এবং কতক কতক মৌখিক ভাষার রীতি দেখা যায়। ভাষার নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কি হল ? এ কোন জাদুকরের জাদু ?

এ যে সহর। ট্রাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে রাস্তায় উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেচে।

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ ? এ কি চাল ? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি ক'রে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায় ?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে। [ রাজপুত্তুর ]।

রবীন্দ্রনাথের অষ্টম উপন্যাস তি ন পু রু ষ নামে বি চি ত্রা পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে বাহির হইতে থাকে। পরে ইহার নাম বদলাইয়া যো গা যো গ রাখা হয়। ইহা পুস্তকাকারে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। যো গা যো গ-ও চলিতভাষায় লেখা, তবে ইহার ভাষা ঘ রে-বা ই রে র ভাষা অপেক্ষা কিছু সরল। যো গা যো গে র ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিলো। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা ব'ল্‌লে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা ক'র্‌চে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেচে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মত, বেলা যায় যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তা'র টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেচে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তা'র মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগলো না ব'লে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা।[১]

শে ষে র ক বি তা ১৩৩৫ সালে প্র বা সী-তে প্রকাশিত হয়। বইটিকে উপন্যাস অথবা বড় গল্প অপেক্ষা উপন্যাস-চম্পু বা গল্প-চম্পু বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ ইহাতে গদ্যের সহিত কবিতাও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সে কবিতাগুলিও গল্পাংশের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। গদ্যের মধ্যে কবিতার ছাঁদও বিরল নহে। শে ষে র ক বি তা-র লিখনভঙ্গি অনেকটা

১। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

parody বা ব্যঙ্গরচনার মত, এবং সেই রকমই কৃত্রিম। ইহার ভাষার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ম্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হ'য়ে ওঠ্‌বার আগুন ওঠে জ্ব'লে'। সেই আগুন জ্বলেচে, অমিত রায় বদ্‌লে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তা'কে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদ্‌লিয়ে দিয়েচ, বন্যা, সেই তালেই ত তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়্‌ল।"

শে ষে র ক বি তা-র পরও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহাদের ভাষার সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণ

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত করেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বলেন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল। অকালে মৃত্যু না হইলে তাঁহার লেখনীর দ্বারা বঙ্গভাষা যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলেন্দ্রনাথের ভাষা মূলতঃ সাধুভাষা হইলেও ইহাতে কথ্যভাষার রীতি মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হওয়াতে সরসতার সঞ্চার হইয়াছে। ভাষার বাঁধুনি সহজ, আঁট-সাঁট অথচ ওজস্বী। দুইটি প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কবি হইতে গেলে যেন আইন প্রণয়নপূর্ব্বক সাধারণ বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সাধারণ বাহ্যজ্ঞান পরিহার করিতে হইবে, সাধারণ সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, আহারে বিহারে, আচার ব্যবহারে, ধরণ ধারণে, সৃষ্টিছাড়া না হইলে চলিবে না। এই ভাবিয়া সেন্টিমেণ্ট্যালেরা কবির সহিত না মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর হয়েন না—জানি কি, কোথায় পদস্খলন হয়, লোকের কাছে প্রতিভা অপ্রতিভ হইবে। [ কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল্ ]।১

কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ-প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাস কলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর

---

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৯৩।

পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিদিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ড-গিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। [ উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র ]।১

রবীন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথও গদ্য লেখায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলির ভাষা সরল, সুন্দর, অনাড়ম্বর এবং মনোরম।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-সংগ্রহের বই ন ব ক থা ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি ইহার পূর্ব্বে প্র দী প, ভা র তী এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে প্রভাত-কুমারের অনেকগুলি গল্প এবং উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

প্রভাতকুমারের ভাষার মূলে বঙ্কিমী পদ্ধতি। ভাষা সরল এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বর হওয়া সত্ত্বেও সরস, উজ্জ্বল এবং সুন্দর। অতি স্বল্প আয়োজনে ভাষাকে এইরূপ মনোহর করিয়া তোলা অল্প কৃতিত্বের কার্য্য নহে। প্রভাতকুমারের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি।

"—আজকাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর! দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক মাফিক্ ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লোক—ডেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্তর নেয়। দিব্যি পাওনা থোওনা হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি একটু লেখাপড়াও জানি কিনা। সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখ্যু তা নই। বল্লে না পিত্যয় যাবে আমি ছাত্রবৃত্তি ফেল। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে বুঝতে পারি এটুকু গর্ব্ব আমার ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড় লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি বাবুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান রয়েছে। নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞান প্রবেশ'। যাঁহা দেখা, বুঝলে কি না তাঁহা বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকাধার্ম্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। অন্য বাড়ীতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে পড়ে, বিজ্ঞানটা বেশ আয়ত্ত-

১। সাধনা, দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ ১৩০০ সাল, পৃঃ ৪৫৯।

করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটির নাম লেখা ছিল, সে পাতটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমার খুব সেবা শুশ্রূষা কর,—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সেখানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়াশুনা কতদূর হয়েছিল?"

মোহিত বলিল, "বেশী দূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি চুচু? ঘট একেবারে উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমার মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিচ্ছু ভেব না। সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে? ও কথা বল্লে চলবে কেন? আজকালকার বাজারে ছাত্রবৃত্তি ফেল সন্ন্যাসী কটা মেলে? চেলা হয়ে পড়, এমন সুবিধেটা হঠাৎ পাবে না কিন্তু।" [ নবীন-সন্ন্যাসী ]।১

প্রভাতকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গল্প লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কতকগুলি গল্প ও নক্‌সা ছাড়া ইঁহার বেশি কিছু রচনা নাই। যতদিন সা হি ত্য পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল তত দিন সুরেন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকাতেই লিখিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের ভাষার ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। বাক্যগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং কাটা কাটা, যেন সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও গায়ে লেপ্‌টাইয়া নাই। কথ্যভাষার শব্দ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করায় ভাষা বেশ সরস। লেখকের সরসতাও ( humour ) বেশ উপভোগ্য। প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সকল রচনাই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে ওতপ্রোত। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি গল্প হইতে কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি।

চিত্রে বেথাপ্পা রঙ্গ পড়িয়া গেলে জল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। অন্য রঙ্গ দিয়া ঢাকিতে গেলে সেটা আরও বেতর হইয়া পড়ে। মানব চরিত্রে 'ওভারটোন' পড়িলে নয়নের জলে মিটাইয়া ফেলা ভাল। কমল সেদিক দিয়া গেল না। রঙ্গ চাপিয়া রাখিল।

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়া সোপ্‌গুলি ছোট দিদিকে দান করিল। একখানা গেরুয়া রঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়া লইল, এবং নির্জ্জনে বসিয়া রবি ঠাকুরের সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উদাস ভাগগুলি পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিল। [ চিত্র ও চরিত্র ]।২

১। প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৩০১।

২। সাহিত্য, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩০৯ সাল, পৃঃ ১০০।

বিবাহটা হইয়া গেল। বরকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবশিষ্ট জ্বরাক্রান্ত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্ব্বাটীতে, নিদ্রাক্রান্ত হইয়া শয়ন করিল।

বাসর-ঘর শূন্য।

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,—বর অতিশয় শান্ত ও সুন্দর। তাহার উপর, আমি যে উদ্বাহ আনন্দে একেবারেই স্পৃহাহীন, তাহা জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। আসল কথা, আমার জ্বর আসিতেছিল। এমন সময় আমার পূর্ব্বে কথনও জ্বর আসে নাই। এটা বোধহয় স্থানপরিবর্ত্তনের ফল। কিংবা হয় ত রংপুরের জ্বর এই সময় আসে। [ সবিরাম জ্বর ]।১

বাঙ্গালা চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদের বিশিষ্ট গদ্যলেখকদিগের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নাম করিতেই হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনায় সমাজপতির তুল্য লেখক খুব কমই পাওয়া যায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস উ মা এককালে যথেষ্ট নাম করিয়াছিল। তাঁহার রচনাভঙ্গি সহজ, সরল এবং সতেজ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ভা র তী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। সাবলীল সাধুভাষায় রচিত ইহাঁর পল্লী-চিত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আদরের বস্তু হইয়া আছে এবং থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যের একটি বিশেষ রীতির প্রবর্ত্তক। এই রীতির অতিশয়িত রূপকে 'বীরবলী' রীতি বা ঢঙ্গ বলা হয়, কারণ 'বীরবল' এই ছদ্মনামে চৌধুরী মহাশয় এই ঢঙ্গে অনেক সরস প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এখনও লিখিতেছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যভঙ্গির বিশেষত্ব এইগুলি। কথ্যভাষাই মূলরূপে

১। সাহিত্য, ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩০৯ সাল, পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

গৃহীত হইয়াছে। কথ্যভাষার শব্দ বা বাক্যাংশের সহিত তৎসম শব্দ এবং বাক্যাংশ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ভাষায় রসসঞ্চার করে এবং পাঠকের কৌতূহল এবং কৌতুকবোধ উদ্রিক্ত করিয়া দেয়। বাক্যগুলি অনেক সময় কাটা-কাটা এবং পরস্পর অসংযুক্ত, অনেকটা জ্যামিতির বা তর্কশাস্ত্রের ভাষার মত গূঢ়ার্থক ( epigrammatic )। বিরোধাভাস-যুক্ত ( antithetic, paradoxical ) উক্তির বাহুল্য পাঠককে যুগপৎ চমকিত এবং চমৎকৃত করিয়া দেয়। 'বীরবলী' ঢঙ্গের এইটাই প্রধান বিশেষত্ব। কথ্যভাষার শব্দের প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের একটা বিশেষ টান আছে ; সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার শব্দাদির প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং যথোচিত সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। ইংরেজী অস্ত্যর্থক ক্রিয়া ( copula )-র স্থলে 'হচ্ছে' শব্দের প্রয়োগ প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাক্যপ্রয়োগ পদ্ধতি অনেকস্থলেই অনুসৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রী পদ্ধতি হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যভঙ্গির উদ্ভব হইয়াছে।

১২৯৮ সালে সা হি ত্য পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের দুইটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,—একটি 'আদিম মানব' প্রবন্ধ, অপরটি 'ফুলদানী' নামে ফরাসী হইতে অনূদিত একটি গল্প। যতদূর জানি, এই দুইটিই বোধ হয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা। 'আদিম মানব' প্রবন্ধটি বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত। তথাপি ইহার মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট সরস ভঙ্গি একেবারেই অস্ফুট নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও প্রতীয়মান। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আজকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এইরূপ নিজ মহত্ত্বে বিশ্বাস ও স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, এতটা না হইলেও বঙ্গসন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। বিজাতীয় ঘৃণা, ম্যালেরিয়ার মত সকলের হৃদয় মন আক্রমণ করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না দিলে লোকে সংবাদ-পত্র পড়ে না। সকলেরই বিশ্বাস, শত্রুর মুখে ছাই অর্পণ করা ব্যতীত, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্য কোনও উপায় নাই।

কোনও বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য। আর্য্যদিগের ন্যায় আর্য্য সহানুভূতিও সাগর পার হইলে জাতি নষ্ট হয়।১

দ্বিতীয় বর্ষের সা ধ না-য় ইতালীয় হইতে অনূদিত একটি প্রবন্ধ ('টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন') প্রকাশিত হয়। চৌধুরী মহাশয় ইহাতেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটু উদাহরণ দিতেছি।

বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তার বিষয় চিন্তা করা, এ দু'য়ের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে বেশী মধুর মনে কর?

টা। বল্‌তে পারিনে। তবে এইটুকু ধ্রুব যে, সমক্ষে তাকে রমণী বলে' জানতুম—চোখের অন্তরালে সে আমার নিকট দেবীরূপে প্রতীয়মান।২

'বীরবল' ছদ্মনামে প্রবন্ধ প্রথমে বাহির হয় ভা র তী পত্রিকায় ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসে। এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট গদ্য ভঙ্গি মূর্ত্ত হইয়া উঠে। যেমন—

আমি বাঙ্গালাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

—তা যদি না পারেন তবে বঙ্গ সরস্বতীর কাণে শুধু পরের সোণা পরান হবে।৩

বীরবলী ভঙ্গির একটি বিস্তৃততর উদাহরণ দিতেছি।

আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিত শাস্ত্রে যাই হোক্‌ সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোন কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসুতার মালার ফরমাস দেওয়া যত সহজ,

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ১২৩।

২। সাধনা, বৈশাখ ১৩০০, পৃঃ ৫১১।

৩। কথার কথা [ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল]।

গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি।১

বীরবলী ভঙ্গির একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে। সেটি হইতেছে বিষয়বস্তুর অপেক্ষা ভাষার চটককে প্রাধান্য দেওয়া। সেই জন্য বিষয়বস্তু তুচ্ছ কিংবা অনুপযুক্ত হইলে রচনা কেবল বাক্‌চাতুরীতে পর্য্যবসিত হয় এবং পাঠককে ক্লান্ত করিয়া দেয়। এইরূপই ঘটিয়াছে চৌধুরী মহাশয়ের আধুনিক দুই একটি প্রবন্ধে এবং তাঁহার অনুকরণকারীদের প্রায় সমস্তগুলি রচনায়। তবে রবীন্দ্রনাথের শে ষে র ক বি তা-র ভাষাতেও যে বীরবলী ঢঙ্গের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, ইহা চৌধুরী মহাশয়ের কম কৃতিত্বের কথা নহে।

চৌধুরী মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা চা র ই য়া রী ক থা। রবীন্দ্রনাথের চ তু র ঙ্গে র প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এই চারিটি গল্পের ভাষা লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং স্বাতন্ত্র্যে ঝলমল করিতেছে। ভাষার চাতুর্য্য কোথাও ভাবকে চাপা দিয়া আখ্যানবস্তুকে অবান্তর অথবা হীন করিয়া দেয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমি যে শত চেষ্টাতেও "রিণীর" মনকে আমার করায়ত্ত২ করতে পারি নি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই— কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদ্‌লাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধুলি৩ আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্ত্তি হত, তার আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টান্‌ত, চুল ধরে টান্‌ত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে' দেখাত।

বিশুদ্ধ কথ্যভাষা যথাসম্ভব তৎসমশব্দ-বর্জ্জিত এবং বালকবালিকা-বোধ্য করিয়া রচিত হইলেও যে কতদূর মধুর এবং মনোগ্রাহী হইতে পারে তাহার

১। খেয়াল খাতা [ ভারতী, বৈশাখ ১৩১২ সাল ]।

২। মূলে 'করায়ত্ব'। ৩। মূলে 'গোধূলি'।

পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমদিককার রচনাগুলিতে। সরল, অনাড়ম্বর কথ্যভাষার ছাঁদে অল্পবয়স্ক বালকবালিকা-দিগের জন্য মুখ্যতঃ লিখিত হইলেও এই আখ্যান এবং গল্পগুলি সাহিত্যে একটি মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনাগুলিও এইরূপ ভঙ্গিতে লিখিত হইলেও দুই একটি মুদ্রাদোষের দরুন সব সময় সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবনীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান মুদ্রাদোষ হইতেছে ক্রিয়াপদ এবং কর্ত্তা ও অন্যান্য কারকের পদের বাক্য মধ্যে সিদ্ধ প্রয়োগস্থানের ব্যত্যাস। সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের সর্ব্বশেষে বসে, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম। অবনীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদকে বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য স্থানে স্থানে অর্থগৌরব আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু পর পর ঐ রকম চলিলে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি অবনীন্দ্রনাথের এই ভঙ্গি বাঙ্গালা গদ্যে কিছু পরিমাণে গতির সঞ্চার করিয়াছে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি সাহিত্যিকের রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির মূলে রবীন্দ্রী পদ্ধতি। শেষের দিকের রচনাগুলির ভাষা 'কথিকা'-র ধরণের।

নিম্নে অবনীন্দ্রনাথের দুই রকম রচনার উদাহরণ দেওয়া গেল।

সূর্য্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহু কষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লান মুখে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল; পরনে ছিন্ন বাস, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! [ রাজকাহিনী]।১

আমাদের সমাজ-সংস্কার হঠাৎ যেমন করতে পারা শক্ত, তেমনি উৎসবক্ষেত্রে শ্রীও আনা শক্ত। নিজের ঘরের মধ্যেও নিজের লোকদের নিয়ে স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে উৎসব, তাতেও সমাজ যখন চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়, পাড়ার পাঁচজন ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ে, তখন সাধারণ উৎসব-ক্ষেত্রে তার চেয়ে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হবে—শ্রীকে আনলে, তা জানা কথা। শাস্ত্রের

১। তৃতীয় সংস্করণ ( ১৩২১ সাল ), পৃঃ ২।

বচন লোকের বচন সে তো ঘর-পর বাছে না, তোমার আমার সুখ দুঃখ বাছে না, ইচ্ছা অনিচ্ছা বাছে না, মেয়েদের ধম্‌কে দিচ্ছে তারা ওদিকে, পুরুষদের ধম্‌কে দিচ্ছে এদিকে, আর বল্‌ছে উৎসব কর আনন্দ কর ঐক্যতানের সঙ্গে! একা একা উৎসবের আমোদের অদ্ভুত রকম ঐক্যতান, যার সুর থাকে পর্দ্দার কোন পারে তার ঠিক নেই, তাল পড়ে জোরে জোরে এপারে উৎসাহে আহূত অনাহূত জনসঙ্ঘের মাথায়। [ উৎসবের কন্‌সার্ট ]।১

ভা র তী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সাহিত্যিকের লেখায় রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কৃত রীতি ও অবনীন্দ্রনাথের রীতির মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত কাব্য-ঘেঁষা গদ্যভঙ্গির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান কালের একজন নামজাদা উপন্যাসকার। প্রথম প্রথম ইঁহারা অনুবাদ কার্য্যই বেশী করিতেন। ইঁহাদের রচনার নমুনা দিতেছি, তাহা হইতেই ইঁহাদের গদ্যভঙ্গির বিশেষত্ব জানা যাইবে।

এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুরু ও শিষ্য—দুই সন্ন্যাসী মন্দিরের পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। কাহারো মুখে কথা নাই,—যেন কাহারও বিরাট আবির্ভাব নিস্পন্দ হইয়া দেখিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব মগ্ন। উদ্যানের মধ্যে বাতাসে গন্ধে একটা মাতামাতি চলিয়াছে;—আকাশের আলো, বাতাসের মর্ম্মর, পুষ্প-পল্লবের সুগন্ধ দেবতার চরণে যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। বাতাস আসিয়া ফুলগুলি ঝরাইয়া দেবতার চরণে স্তূপীকৃত করিতেছে—গন্ধ সেখানে আশ্রয় খুঁজিতেছে। আরতির প্রদীপের মুখে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে। [ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় : আবির্ভাব ]।২

সকাল বিকাল নূতন মালীর ভক্তিদান পাইবার জন্য রাজকুমারীরা যখন গোলাপ-কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুলবীথির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙা চরণ ফেলিয়া মালীর কুটীরের কাছে ভিড় করিয়া জমিত, তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়া উঠিত, গাছে গাছে রূপ-যৌবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটিত, কলহাস্যে কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠ খুলিত।

১। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০ সাল, পৃঃ ২-৩।

২। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৫২৩।

আর বসন্ত? পত্রপুটে তাজা ফুলের শিশিরভিজা মালার ভেট আনিয়া সে আপনার সেবাবৃত্তি সার্থক করিত। [ শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; অপরাজিতা ]।১

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বড়দরের কবি ছিলেন। যেমন তাঁহার অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম ছন্দবোধ ছিল, কথ্যভাষার শব্দকোষের উপর দখলও তাঁর তেমনি ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যে পদ্যের মাধুর্য্য বিদ্যমান, অথচ অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। গদ্যভঙ্গি এইরূপ কাব্য-ঘেঁষা হওয়াতে রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে যেন দৃঢ়তার অভাব অনুভূত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথমদিককার গদ্যরচনার অধিক ভাগই অনুবাদ। শেষকালে তিনি একটি উপন্যাসের পত্তন করিয়াছিলেন। ইহার নাম ড ঙ্কা-নি শা ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই চমৎকার উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্র বা সী-তে এই অসমাপ্ত বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ ড ঙ্কা-নি শা ন হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাইশ শো বছরের কথা! সুপ্ত স্মৃতির বাইশ কৌটোর ভিতরকার জিনিষ। সাত পুরুষের বহু পূর্ব্বের, তোমার আমার সত্তর পুরুষ আগেকার কাহিনী। আকাশে সপ্তর্ষি তখন পুর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ; আর মর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্তে, মগধের সিংহাসনে, আর্য্য শূদ্র মহাপদ্ম নন্দের সন্তান, মহারাজ দশসিদ্ধিক নন্দ, তখন মহামহিমায় বিরাজ করছেন। চার-লাখী শহর পাটলীপুত্র তাঁর রাজধানী। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী থেকে চম্পানগরের চাঁপার জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য। তিন লাখ তাঁর সৈন্য, আর দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।২

বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য্য, সাধুভাষার রচনাশক্তির ঔজ্জ্বল্য, সম্পূর্ণ বিস্মৃত অতীত-যুগের কাহিনীকে অখণ্ড ভাবে চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া ধরে। ভাষার প্রয়োগেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন—সুদূর অতীত শক-কুষাণ যুগ অথবা গুপ্ত কিংবা পাল-যুগের কাহিনীর বর্ণনায় তিনি তৎসম

১। প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ সাল, পৃঃ ২১৬।

২ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০ সাল, পৃঃ ২৮৯।

শব্দপূর্ণ বিশুদ্ধ সাধুভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু মোগল যুগের কাহিনীর বেলায় কথ্যভাষা মিশ্রিত লঘু সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া বিষয়বস্তুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস ড ঙ্কা-নি শা ন ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে খুবই উপাদেয়, কিন্তু কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বিষয়বস্তুর মর্য্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দুইটি বিভিন্ন যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত দুইখানি উপন্যাস হইতে রাখালদাসের রচনাপদ্ধতির নমুনা দেওয়া হইল।

যখন তোরণে তোরণে দিবসের প্রথম প্রহরান্তে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল তখন নগর-প্রান্তের শিবির হইতে সপ্তদশজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিল। সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ের মহা-প্রতীহার পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহার পরে দ্বাদশজন দণ্ডধর সুবর্ণদণ্ড হস্তে চলিয়াছে। তাহাদিগের পরে শ্বেতবর্ণ বনায়ুজ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত ষোড়শজন রাষ্ট্রকূট রাজদূত, তাঁহার পশ্চাতে শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত রাষ্ট্রকূট অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে গৌড়ীয় অশ্বারোহী। মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরীর শব্দে নাগরিকগণের কর্ণ বধির হইল। বাতায়ন ও গবাক্ষ হইতে শ্রাবণের বারিধারায় ন্যায় রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

শোভাযাত্রা যখন প্রাসাদের তোরণে পৌছিল, তখন অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। প্রাসাদ-তোরণে মহানায়ক প্রমথসিংহ ও মহামন্ত্রী গর্গদেব তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্বেতপুষ্প ও মুক্তার সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপতল দিয়া মহাপ্রতীহার ও রাজদূত রক্ষীগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মণ্ডপের তোরণে কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধদেব ও মহাকুমার পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীবাক্‌পালদেব তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রায়ুধ ও বাক্‌পাল দূতকে মধ্যে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডলে সমবেত জনসঙ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, সেনানী ও সৈনিকগণ অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা ও তূরী বাজিয়া উঠিল। [ ধর্ম্মপাল ]।

ময়ূখ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে উঠাইয়া সমাধির নিকটে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া ময়ূখের হস্তে দিল। ময়ূখ তাহা বাদশাহের হস্তে দিলেন।

বাদশাহ্ অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ফকির, তুমি সপ্তগ্রামের সেই বৈষ্ণব?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থনা আছে।"

"প্রাসাদে গেলে না কেন?"

"মহারাজ, আমার মন বলিয়া দিল যে ইহাই উপযুক্ত স্থান।"

"ফকির, তুমি কি চাহ?"

"আমার গুরু বন্দী হইয়াছেন, মহারাজ দয়া করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করুন।"

তখন মমতাজ-ই-মহল আরজ্‌মন্দ বাণু বেগমের জগদ্বিখ্যাত সমাধির ভিত্তি নির্ম্মিত হইতেছিল। কতিপয় ফিরিঙ্গী বন্দী দূরে মৃত্তিকা বহন করিতেছিল, বৃদ্ধ অঙ্গুলী চালনা করিয়া তাহাদিগের একজনকে দেখাইয়া দিল। বাদশাহের আদেশে ময়ূখ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিকলাঙ্গ বৃদ্ধকে দেখিয়া ফিরিঙ্গী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সস্মিত বদনে তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, একদিন পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলে, অতএব তুমি আমার গুরু, বাদশাহের আদেশে মুক্ত।"

বাদশাহ্ ময়ূখকে ইঙ্গিত করিলেন, ময়ূখ ফিরিঙ্গীর বন্ধন মোচন করিলেন। ফিরিঙ্গী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যমুনাতীর হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিল, সৈকতের রাশি রাশি কাশগুচ্ছ সমাধির শুভ্রমর্ম্মরের উপরে ছড়াইয়া পড়িল, বাদশাহ্ কঠিন শীতল শ্বেত মর্ম্মর আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে গুল্‌রুখ ও ললিতা নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া ময়ূখও সমাধির পশ্চাতে জানু নত করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। এতক্ষণে ফিরিঙ্গীর নয়নে অশ্রু দেখা দিল, সে স্বদেশের প্রথানুসারে নতজানু হইল।

সেই ফিরিঙ্গী বন্দী হুগলীর পাদ্রী আল্‌ভারেজ। [ময়ূখ]।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা হইতেছে ব ড় দি দি। ইহা ১৩১৪ সালের ভা র তী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর য মু না পত্রিকায় কতকগুলি গল্প এবং চ রি ত্র হী ন উপন্যাসের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভা র ত ব র্ষ পত্রিকায় তাঁহার অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাসগুলি প্রায় সবই বাহির হয়। শরৎচন্দ্রের আধুনিকতম উপন্যাস বি প্র দা স বি চি ত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকাশের তারিখ হইতে শরৎচন্দ্রের সকল গল্প এবং উপন্যাসের রচনা-কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা চলে না। পূর্ব্বেকার অনেক লেখা পরে প্রকাশ করা হইয়াছে। রচনারীতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহা ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির প্রভাব খুব স্পষ্ট নহে, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ উপন্যাসের ছাঁচ জাজ্বল্যমান।

রবীন্দ্রনাথের ধরণে উপমা ও উৎপ্রেক্ষাদির প্রয়োগ মধ্যে মধ্যে আছে; কিন্তু তাহা প্রায়ই এলোমেলো বা সঙ্কর ( mixed ) ধরণের, তাহাতে বাঁধুনি নাই। যেমন—

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয়-সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুক-ফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে। [ শ্রীকান্ত; দ্বিতীয় খণ্ড ]।

কিন্তু, নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে-একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া স্থির হইয়া আছে। [ ঐ ]।

সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বকশলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে। [ আঁধারে আলো ]।

—এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। [ ঐ ]।

কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়। [ স্বামী ]।

—শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহাকে শুধু ঝাপসা দুর্নিরীক্ষ করিয়াই আনিতেছে। [ নিষ্কৃতি ]।

—কিন্তু এইসকল দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসঙ্গত অভিমানের হাত ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। [ নববিধান ]।

অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার মন বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। [ ঐ ]।

অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এবয়সে তাহার হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল্ যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগরদোলায় ঘুরপাক খাওয়াইয়া মারিতেছে। [ ঐ ]।

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল! তাহার এক বিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে গিয়া পৌছিল না। [ কাশীনাথ ]।

পর পর দুইটি বাক্যে একই কর্ত্তৃপদ থাকিলে, দ্বিতীয় বাক্যে কর্ত্তৃপদ উহ্য করা রবীন্দ্রনাথের লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই প্রয়োগের বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেমন—

—তিনি ডেকে বল্‌লেন, "আজ এত ভোরে উঠলে যে?" বল্‌লুম, "ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।" বল্‌লেন, "একটা কথা আমার শুনবে?" রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বল্‌লুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনি?" [ স্বামী ]।

ঊষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, "আমরা বুড়োমানুষই নিজের উচিত করে উঠ্‌তে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ।" [ নববিধান ]।

রবীন্দ্রনাথের ধরণে 'এবং' শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট আছে। যেমন—

—অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্বেও১ সে আপনাকে সম্বরণ২ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো। [ নববিধান ]।

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও 'নিরতিশয়' শব্দটির বিশেষ ভক্ত। শুধু দে ব দা স বইটিতেই নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়াছি।

নিরতিশয় ধৈর্য্যের সহিত; নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া; নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না; নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া; নিরতিশয় ঘৃণাভরে; নিরতিশয় পবিত্র হইয়া।

নারীসুলভ অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্যের অযথা প্রয়োগ শরৎচন্দ্রের ভাষার

১। 'সত্ত্বেও' হইবে। ২। 'সংবরণ' হইবে।

একটা বড় বিশেষত্ব। যেখানে সেখানে 'অপি'-অর্থবাচক (emphatic এবং inclusive) 'ই' এবং 'ও' এই দুই প্রত্যয়স্থানীয় অব্যয়ের ব্যবহারও এই পর্য্যায়ে পড়ে। উদাহরণ—

কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। [শ্রীকান্ত : দ্বিতীয় খণ্ড]।

কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। [ঐ]।

—তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পারিলাম না। [ঐ]।

—একথা ভাবলেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। [ঐ]।

অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে তাহাই ত জানি না। তবে, আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান্ হওয়ার চেয়ে ভাল ভাবিয়া নির্ব্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশীই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। [ঐ]।

'অবধি নাই'; 'এম্‌নিই বটে'; 'সত্যকার'; 'বোধ করি'; 'চক্ষের পলকে'; ইত্যাদি কতকগুলি পদ ও বাক্যাংশ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বারম্বার', 'সম্বরণ', 'সম্বাদ' প্রভৃতি স্থলে অনুস্বারের স্থলে ম-কারের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষাতেও ভুল বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ, শরৎচন্দ্রের লেখা স্থানে স্থানে এতদুর অমার্জ্জিত যে সকল সময়ে তাহা ক্ষমা করা দায় হইয়া উঠে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

'মূর্ত্তিমান নোংরা এক যোড়া কাবলি-আলা'; 'এই মূর্ত্তিমান্ ইতরটার পাশে'; এখানে 'মূর্ত্তিমান্' পদটি কোন অ-বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দের বিশেষণ হওয়া উচিত ছিল। Jetty এবং Medical College শব্দের বাঙ্গালা রূপ, 'জেঠি'[১] 'ম্যাডিকেল কলেজ'[৩] অমার্জ্জনীয়। 'পাড়াগ্রামে'[২] বালকোচিত গুরুচণ্ডালী প্রয়োগ। 'বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল';[৪] 'একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি';[৪] 'ধরা-চূড়া'[২] এইগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ

১। শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড। ২। নিষ্কৃতি। ৩। দেবদাস। ৪। একাদশী বৈরাগী।

হওয়া দুষ্কর। 'সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোন মতে কাজ সারিল'।[১] (বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে যে বুট পরিয়া থাকে, তাহা আমাদের জানা ছিল না) 'অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা'।[১] ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।[১] 'কেৎলি'[১] বোধ হয় 'কেট্‌লি' এবং 'কাৎলি' এই দুয়ের জোড়কলমে হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, ইহা স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর। ভাষা কোথায়ও বিষয়বস্তুকে ছাপাইয়া উঠে নাই। (শেষের দিককার কয়েকটি বই সম্বন্ধে এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষীণতা সত্ত্বেও শুধু লিখিবার প্রয়োজনে কথা বাড়ান হইয়াছে।)

শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া রাখা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, "আমি কি আর যে সে লোক আছি যে, যা তা করব?" কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, "স্বস্তি পাই না—স্বস্তি পাই না।" সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দ্দিক্-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে,—সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ নির্ম্মল সরোবরে তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থ বৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই। [কাশীনাথ]।

মধ্য ও শেষ যুগের রচনার নমুনা কিছু কিছু নিম্নে দিলাম। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রী পদ্ধতির ছাঁচ কম বেশী প্রত্যক্ষ।

১। নববিধান।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখে কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নি বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন মনে হয়, যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে; যেন তা'র ভিতরে প্রাণ আছে;—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, "চুপ কর! মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।" [ শ্রীকান্ত: দ্বিতীয় খণ্ড ]।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিক্‌টাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলচি তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না! নির্জ্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ। [ স্বামী ]।

সোমেনের মা হইলেও বা দু'দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু উষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে-গড়া স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তা' হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগলামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল! এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে উষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই চারি জন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। [ নববিধান ]।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিম্বা, এমনই হয়ত সকল মেয়ের প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিম্বা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিষ নয় মুখুয্যে মশাই,—ওটা মরীচিকা। [ বিপ্রদাস ]।[১]

১। বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪০, পৃঃ ৯।

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষের দিকে আবির্ভূত গদ্য লেখকদিগের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মনাম গোপন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার সরস, মধুর, হাস্যরসাত্মক রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে কেবল ত্রৈলোক্যনাথের সহিত 'পরশুরাম'-এর তুলনা করা চলে। ইঁহার লেখা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত অথচ সরস-মধুর এবং পরম উপভোগ্য। নিম্নে কিছু উদাহরণ দিলাম।

পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকচে। চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বল্লেন—এমন বাঘ ত দেখিনি, গাধার মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েচে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও; বক্‌শিস মিলবে। [ দক্ষিণ রায় ]।

এই কেদার চাটুর্য্যেকে সাপে তাড়া করেচে, বাঘে পিছু নিয়েচে, ভূতে ভয় দেখিয়েচে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিস-কোর্টের উকিল জেরা করেচে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো ঘটেনি। বছর ষাট বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয়নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনি করে দিলে। থাকতে না পেরে বল্লুম—মেম সাব, কেয়া দেবতা ? [ স্বয়ম্বরা ]।

তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট খাদ্যসামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোকরে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত, ওয়া হমীন্ অস্ত। [ কচি-সংসদ ]।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'পরশুরাম'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনিও সরস-রচনায় সবিশেষ দক্ষ। তবে ইঁহার লেখার সহিত 'পরশুরাম'-এর লেখার সম্পূর্ণ

পার্থক্য। 'পরশুরাম' বিভিন্ন বাস্তব-চরিত্রের ( type-এর ) রচনায় অদ্বিতীয়, আর কেদারনাথ দুই একটি চরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত। 'পরশুরাম'-এর সরসতা ( humour ) অনাবিল, সরল, এবং সহজবোধ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ( intellectual ) দুইই,—ভাষার সারল্যের জন্য কোথায়ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে নাই। কেদারনাথের সরসতা ( humour ) অনেকটা পরিমাণে পাত্রপাত্রীর idiosyncrasy বা ব্যক্তিগত বৈকল্যের উপর নির্ভর করে। কথার মারপ্যাঁচ একমাত্র উপজীব্য হইলে সরসতা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে। এই দোষ কেদারনাথের কোন কোন রচনায় স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান। তবে করুণ রসের সূত্রে সরস ভঙ্গি গাঁথিয়া ইনি যে কয়টি গল্প লিখিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই পরম উপভোগ্য।

চব্বিশ পরগণার অংশবিশেষে এককালে প্রচলিত উপভাষা এবং উচ্চারণভঙ্গি কেদারনাথের ভাষার সরসতার একটি প্রধান উপাদান। এই হিসাবে কেদারনাথের ভাষা হু তো ম প্যাঁ চা র নক্ সা-র ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারের বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে। অনেক সময় অর্থগ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হয়। যেমন—ভেন-ঘর (=ভিয়ান-ঘর), মশা (=মহাশয়, মশায়, মশাই), বেন (=বেহান), ধোঁ (=ধোঁয়া), নেম (=নিয়ম), ইত্যাদি। অনুপ্রাস এবং যমকের প্রয়োগ প্রায়ই খুব খেলো ধরণের। যেমন—'এই দন্তটী ব্রজপুরের বাবুদের সত্ত্বকত্ত্ব রেখে আসেন নি। জালে অমন সিদ্ধ হস্ত কাল কলিতে জন্মায়নি।' 'বাসাটি বারোদ্বারির ব্রাদারের মত হওয়া চাই।' 'কারণ, সুদে আসলে মাইনের টাকা গুল্‌জারির গর্ভে গিয়েছে, এখন তিনি যা রুল্ জারি করেন।' আমরা সবাই তো 'রেলওয়ে ব্রাদার্স' ফেডারেসনের, ডেকরেসন্ দাদা—খাস্ তালুকের শালুক।' ইত্যাদি।

অথবা slang ( বা অ-সাধুভাষা ) ব্যবহার করায় অনেক সময় গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটিয়াছে। যেমন—'চিনিতে পারিনি, অবহেলা করে, আজ

অবেলায় মূচ্ছো মেরে গেলুম।' 'বিস্ময়ে ঠোঁট দু'খানা ঢিলে মারতেই, মুখ থেকে বিড়িটা পড়ে গেল।' ইত্যাদি।

পর পর সংক্ষিপ্ত (elliptical) বাক্য প্রয়োগ করা কেদারনাথের নিজস্ব পদ্ধতি। বিষয়বস্তুর পক্ষে ইহা অনেক স্থলেই বেশ উপযোগী হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যও যে হয় নাই এমন নহে। যেমন—

"এখন আর এক-পা বাড়াও—আড্ডা খোঁজ। ভগবান্ তিন পা বাড়িয়ে বলিকে গোরে-পাঠিয়েছিলেন! শক্তিপতির তো দোরের মাথায় হাত পৌঁছোয় না, বোধ হয় বামন অবতারই হবেন। পাঁচ চালেই মাৎ, পাঁচ আড্ডায় পা পড়লেই দিন যায় রাত্রি আসে! তার পরেই লম্বা,—সিগারেট থাকে—টেনো।"

দুই এক স্থলে তৎসম শব্দের ভুল বানান করা হইয়াছে। যেমন—'অন্তঃপুরীকা,' 'সূত্রপাৎ,' 'ছায়াপাৎ,' 'ইঙ্গিৎ,' ইত্যাদি।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশে বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি লেখকের অনুসরণে অস্থানে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই ব'লে তিনি মাধবের হ্যাণ্ডনোটখানা দেরাজ থেকে বার ক'রে মাধবকে দেখতে দিয়ে বললেন—"এ লেখা কার, সইটে কার?"

মাধব সাগ্রহে দেখিতে গিয়ে সহসা যেন ধাক্কা খায়। সাক্ষীরূপে ভগবতী চাটুয্যে মশাই সই করিয়াছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণ টা মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উমেশ বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নীচু করে' থাকে। উমেশবাবু বলেন—"এখন কি বল? এ হ্যাণ্ডনোট্ কি তোমার নয়?" মাধব কাতরতামিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বলে—"না বলবার তো যো নেই উকীলবাবু! [পাথের: দূরের আলো]।

কেদারনাথের নিজস্ব ভঙ্গির উদাহরণ দিতেছি।

তবে—উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার—খোলাই ছিল। উত্তমর্ণ উদার—এবং দেদার। কম্বল ক্রমেই ভারী! বড় দোকানেই ঢুক্‌লুম। গুঁই মশাই কাপড়ের ফর্দ্দ দেখে আমার পায়ের ধূলো নিলেন। বল্‌লেন,—"আহা—দেশে এখনও দেবতা আছেন বই কি! নইলে আর দুনিয়া চলে,—আছেন বই কি! আমার পরম সৌভাগ্য, তাই দেখতে পেলুম। সেকালে সব

এইরকম সংসারই তো ছিল। তেমনটি আর নজরে পড়ে না। দোকান-পেতে এই যা দেখলুম! এখন সব দ্বৈতবাদী—রাজানুজের অনুজ, স্বামী-স্ত্রীর সংসার, তাও ম্যালথস্ মার্কা! হরেকৃষ্ণ…"

দুঃসময়ে যা ঘটে ভাই,—মুখ-দে সগর্ব্বে বেরিয়ে গেল—"সেকি মশাই! মন্ত্র পড়ে রাখি বাঁধার পর আর কি ঠাঁই ঠাঁই…"

পায়ের ধুলো repeat করে বললেন—"আহা, এইতো কথা।—কে বলে ধর্ম্ম নেই! এ শতকরা দশ জন থাক্‌লে আজ...হরেকৃষ্ণ,—"

—"দেরে উদ্ধোব খাঁটি শান্তিপুরী গাঁট্‌টা। দেখিস্—বিলিতীর সঙ্গে ঠ্যাকাঠেকি না হয়, খবরদার—শুনচিস্?" [ দুঃখের দেওয়ালি : শান্তিজল ]।

বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি তরুণ- এবং অতরুণ-বয়স্ক লেখকের হাতে এক প্রকার গদ্যভঙ্গির উদ্ভব হইয়াছে। এই অভিনব গদ্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তুও যেমন বিলাতি-গন্ধি, লেখার ধাঁচও তেমনি ইংরেজি ছাঁচের। রবীন্দ্রী পদ্ধতির কাঠামোর উপর বীরবলী ভঙ্গির প্রলেপ দিয়া এবং ইংরেজী শব্দ ও বাক্যপ্রয়োগ রীতির রাংতা মুড়িয়া এই গদ্যের সৃষ্টি। লোভী শিশুর এবং ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের নিকট অপথ্য বড়ই রুচিকর। সুতরাং কতকগুলি অকাল-পক্ক বালকের ও তরুণায়িত বর্ষীয়ানের মারফৎ এই সাহিত্য, এবং তাহার বাহন যে বিশেষ গদ্যভঙ্গি তাহা, দ্রুতভাবে প্রসার লাভ করিবে তাহা জানা কথা। বাঙ্গালা ভাষায় হয়ত এই ভঙ্গিই অনতিবিলম্বে একাধিপত্য লাভ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহা এখনও বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এবং ইহা যে ইতিমধ্যেই পরীক্ষাবস্থা ( experimental stage ) উত্তীর্ণ হইয়াছে একথাও বলা চলে না। সেই কারণে এই 'অতি-আধুনিক' গদ্য ভঙ্গিকে বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে রাখাই সঙ্গত মনে করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিলাম।

---

# সংযোজনী

১৩৪০ সালের চৈত্র মাসের ব ঙ্গ শ্রী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে লিখিত একটি নাটকের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকটির গদ্যাংশ বাঙ্গালায় লিখিত। যদিও নাটকের গদ্যকে বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত করা হইয়াছে, তথাপি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে লেখা বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বলিয়া, এই নাটকটির বিকৃত ভাষার পরিচয় স্বরূপ বাগচী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো, তুমার রাজাসনে আমাকে কার্য্য না হয়, তুমার রাজাসনে বেদা [=বিদায়] মাগিয়া অমী জাইবো। অহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র তুমি মায়া এড়িতে না পারো, তুমী উদনা পতুমার সংগে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো, তুমার সনে আমার কার্য্য না হয়।[১]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। শিক্ষা সমাপন হইলে তাঁহারা পরীক্ষা দিতেন। পরীক্ষার অঙ্গ স্বরূপ তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে হইত। এই বক্তৃতাগুলি Primitiæ Orientales শীর্ষকে কয়েক খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে এইরূপ দুই খণ্ড Primitiæ Orientales ব্যবহার করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। নিম্নে দুইটি বক্তৃতার প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিয়া তখনকার দিনে ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ বাঙ্গালায় কিরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা দেখাইতেছি। তখনকার দিনের পক্ষে এই বক্তৃতাগুলির ভাষা নেহাত নিন্দার হয় নাই। তবে ইহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়

---

১। বঙ্গশ্রী, চৈত্র, ১৩৪০ সাল, পৃঃ ২৯৩।

বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের যে হাত কিছু ছিল না তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

নিম্নের বক্তৃতাটি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে মার্চ্চ তারিখে জেম্‌স্ হাণ্টার (James Hunter) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাতে ছেদ-চিহ্ন মোটেই প্রযুক্ত হয় নাই।

হিন্দু লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যা বৃদ্ধির হানি হয়।১

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং শ্বচুতা-২ প্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রমন্তায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন ২ রীতির এই কারণ যে আপন ২ স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই দুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্বদেশে পৃথক ২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে [।]৩

নিম্নের বক্তৃতাটি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর এ, বি, টড (A. B. Tod) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ইহাতে মধ্যে মধ্যে ছেদ চিহ্নের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

—মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়।৪

ইওরোপীয়েরদের মধ্যে যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিদ্যার ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয় ইহা সকলের স্বীকৃত জানিয়া আমি বিচার করিয়া বুঝি আমার পক্ষে যেকথা প্রমাণ দেয় ও আমার পক্ষে স্থির করে সেই অল্প কথা আমি বিবরণ করিয়া কহি। যে লোকেরদের মন ও আচরণ উত্তর ২ ভাল করিতে আমার এ রচনার আশয় হয় সেই লোকেরদের সম্প্রতি চলন পূজাদি ভজনা কেবল বিচার সভ্য বহির্ভূত ক্রিয়া এবং প্রতিমা পূজা মাত্র। দেবতাভিমানি

---

১। এইটি বক্তৃতার বিষয়।

২। 'শুদ্ধতা'- হইবে বলিয়া বোধ হয়।

৩। Primitiæ Orientales, Vol. II, পৃঃ ৬৮। ছেদ-চিহ্ন মূলে নাই।

৪। এইটি বক্তৃতাটির বিষয়।

ব্রাহ্মণেরদের প্রতি যে আত্যন্তিকী ভক্তি ও মর্য্যাদা করিতে ইতরলোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত্ প্রযুক্ত এই হয় ইতরলোক এই চলিত ব্যবহারের অন্যথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরস্পর মেলা আহারব্যবহারের বাধা হয় এবং কোন দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে ইতর লোকের বড় বিদ্যা শিষ্টাচার হওয়া অতি দুর্ল্লভ ইহা নিঃসন্দেহ [।][১]

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপাললাল মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত জ্ঞা ন চ ন্দ্রি কা নামক পুস্তক হইতে দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথম অংশটি অনুষ্ঠান পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা শিষ্ট জনের জন্য লিখিত। আর দ্বিতীয় অংশটি গ্রন্থ মধ্য হইতে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা শিক্ষার্থী বালক ও জন সাধারণের জন্য লিখিত। বইটির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ও হরপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হইবে। সুতরাং রচনা কালের হিসাবে বইটির ভাষা প্রাচীনগন্ধি (archaic) বলিতে হইবে। জ্ঞা ন চ ন্দ্রি কা পুস্তকটি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সৌজন্যে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্রণীত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল মণ্ডিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিগ্রহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞ বিশারদ ব্যক্তি বর্গ সন্নিধানে বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন এই যে এতদ্দেশীয় (বালকাদি সাধারণ জন সমূহের) কিতাবৎ কি তাবৎ সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থ সুললিত প্রচলিত সাধু সরল শব্দ সম্বলিত কোন বিশেষ পুস্ত প্রচারিত না থাকাতে ত্রিবিধ দোষের হেতু হইতেছে অর্থাৎ প্রথমতঃ কিয়দংশ উৎসাহান্বিত মহাশয়ের মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্য আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞ জনেরদের সর্ব্বদাই পরকান্তাধরামৃত পানেচ্ছাদি নানাবিধ নিন্দাজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি, তৃতীয় ভাষা ভূষিত নীতি বিষয়ক গ্রন্থবিরহে দেশভাষা ও সভ্যতার ক্রম বিনাশে সর্ব্বতোভাবে সমাগ্পকার যদি ও দেশোপকারকল্পে স্বর্গবাসি গুণরাশি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডা পণ্ডিত মৃত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কর্ত্তৃক বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ইদানীং শ্রীরামপুরস্থ ছাপাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তথাপি তাহার প্রথমাংশ অতিশয় সুকঠিন তন্নিমিত্ত তদভিপ্রেত ভাবার্থ রসাস্বাদনে রসজ্ঞ না হওয়াতে অনেকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির শরণাগতা হয়েন এবং বিজ্ঞোত্তম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় প্রণীত পুরুষপরীক্ষা পুরুষপরীক্ষার হেতু বটে ফলতঃ

১। Primitiæ Orientales, Vol. III, পৃঃ ৪৯-৫০। মূলে ছেদ চিহ্ন নাই।

বহুকাল প্রকটিত জন্য আধুনা সেই গ্রন্থের অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য হওয়াতে তত্তাবদ্‌বৃত্তান্ত দর্শন স্পৃহায় মর্ম্মার্থি মনুষ্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্রতাই সর্ব্বদা বৃদ্ধি হয়।১

কামিক্ষানিবাসী পরমানন্দ নামক একব্যক্তি অতিধনী ছিলেন তিনি সতত স্বেচ্ছাচারে রত ও শাস্ত্র ব্যবহার ও যুক্তি সিদ্ধরীতির বিপরীত রীতিতে রত হইয়া কেবল সকল লোককে পীড়া প্রদান করিতেন আর স্ত্রীপুত্র ও পিতামাতা প্রভৃতি কাহার প্রিয় ছিলেন না এবং সকলজন সহ সদা শত্রুতাচরণ করিতেন। অপর পরমানন্দের স্বেচ্ছাচারিত্ব হেতু তাঁহাকে সকল লোকেই অমান্য ও নীচজ্ঞান করিতেন আর ঐ পরমানন্দের দৌরাত্ম্যে সকল জনই সতত ক্লেশ পাইত ইতি মধ্যে তদ্দেশস্থ গোপজাতীয় রমানাথ নামক এক ব্যক্তি ছিল তাহার গৃহে ঐ, পরমানন্দ নিশিযোগে যাইয়া বদ্ধ বৎসকে মুক্ত করিয়া দিত ও অন্য ২ বহু অনিষ্টাচরণ করিত কিন্তু কিয়দ্দিবসান্তর ঐ রমানাথ গোপ তাহা জানিয়া ঐ পরমানন্দকে নিগুড় প্রহার করত পঞ্চত্ব· পাওয়াইলেন। অনন্তর তদ্দেশস্থ লোক সকল ও তন্মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব দেখ জ্ঞান ও মান ও প্রাণ ও ধন সকল নাশকারি যে স্বেচ্ছাচার তাহা আচরণ করণে বিরত হও।২

---

১। অনুষ্ঠান পত্র, পৃঃ (১)-(২)।

২। পৃঃ ১৪১-১৪২।

# নির্ঘণ্ট-পত্র